২য় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা
১৩৪৪

সচিত্র ভারত

২রা অক্টোবর
১৬ই আশ্বিন, শনিবার

শক্তি

শিল্পী—কে, সি, পাল

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

ক্রূর কামানল মন্ত্র

শচী কান্ত দাস

ঘটনা অত্যন্ত আকস্মিক—তাহা হউক। আকস্মিক ঘটনাই কিছু পৃথিবীতে কম স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায় না। চট্ করিয়া দৃষ্টান্ত মনে আসিতেছে না—আপনারা স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করিতে পারেন।

রংপুরের বাব্‌লাহাটির জমিদার মৃত বসন্তরঞ্জন চৌধুরীর একমাত্র পুত্র হেমন্ত চৌধুরী কলিকাতায় এম্-এ পড়িতে আসিল। বিধবা মাতা পুত্রকে এই ডাইনীর রাজত্বে একা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন না; সুতরাং কলিকাতায় বাসা ভাড়া লইতে হইল। তাঁহার প্রাত্যহিক গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য শোভাবাজার অঞ্চলে গ্রে ষ্ট্রীটের উপরে একটি ছোট্টখাট্ট পরিপাটি বাড়ী সরকার মহাশয় বন্দোবস্ত করিলেন। মা ও ছেলে, হেমন্তের পিসতুতো এক বোন নলিনী, সরকার হরিহর লাহিড়ী, ঝি, চাকর, দারোয়ান মিলিয়া মোটমাট নয় জন; হেমন্ত নাম দিয়াছিল 'নবরত্ন'।

কলেজে টাকা জমা দিয়া আসিয়া সিঁড়ি দিয়া তেতলায় নিজের ঘরে উঠিতে যাইবে ঠিক পাশের বাড়ীর চিকফেলা দোতলা বারান্দায় হাত দিয়া অপসারিত চিকের ফাঁকে একটি কচি কৌতুহলী মুখ দেখিয়া হেমন্ত থমকিয়া দাঁড়াইল—নবাগতদের দেখিবার ইচ্ছায় মেয়েটি চিকের বাধা মানিতেছে না।

ব্যাপারটি অত্যন্ত আকস্মিক এবং অকল্পিত। মেয়েটির দৃষ্টি চট্ করিয়া হেমন্তের দিকে গেল এবং নিমেষ মধ্যে হেমন্তের নিস্তরঙ্গ মনে একটা ঢেউ তুলিয়া চিকটি যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল।

মুখখানি অপূর্ব্ব লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত, চকিতভয়ে বিস্ফারিত দুটি চোখ, ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের সামাজিক উপন্যাসে যেমন বর্ণনা পাওয়া যায় ঠিক তেমনিটি। হেমন্ত খানিকক্ষণ সিঁড়ির ধাপ হইতে নড়িল না। ঘর গুছাইবার পরিশ্রমের ক্লান্তিতে মা ও নলিনী ঘুমাইতেছেন। প্রখর গ্রীষ্মের পড়ন্ত মধ্যাহ্নে সমস্ত পাড়ায় কেমন একটা নিশুতির ভাব—রহিয়া রহিয়া দ্রুতগামী ট্রামের অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি কানে আসিতেছে।

নিস্তরঙ্গ চিকে আর বিক্ষোভ দেখা গেল না—একটি নাম শুধু কানে আসিল; ভিতর হইতে কে যেন কাহাকে 'সুকল্যাণী' বলিয়া ডাকিল—ডাকনামের পক্ষে বড়, কিন্তু কি অপরূপ নাম!

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আপনারা হেমন্তকে কবি ও ভাবুক ঠাওরাইয়া বসিতেছেন—হেমন্ত ও দুটার একটাও নয়। সে পলিটিশিয়ান এবং অ্যাথলেট। প্রাচ্যে চাণক্য এবং প্রতীচ্যে বিসমার্ক তাহার আদর্শ; ভাগ্যদোষে রূপার চামচ-মুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাই জীবনে কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারিতেছিল না বলিয়া দুঃখিত আছে। তাহার ইচ্ছা ছিল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র 'এডিট' করিয়া বাহির করে—শ্যাম শাস্ত্রী সে কাজ আগেই সারিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাহার ক্ষোভের অন্ত ছিল না। ফুটবল ও হকিতে উত্তরবঙ্গে সে অদ্বিতীয় ছিল, টেনিসটায় তেমন জুৎ করিতে পারিত না। কলিকাতার সাউথ ক্লাবে ঢুকিয়া সে বিষয়েও পারঙ্গম হইবার গোপন মতলব তাহার ছিল। এহেন হেমন্ত ভাবুকতার আবেগে বিহ্বল হইবে না, বাঙালী লেখক হইয়াও একথা আমরা জোর গলায় বলিব।

তবে? মা কলিকাতা সহরটাকে ডাকিনীর লীলাভূমি কল্পনা করিয়া সর্ব্বদা আতঙ্কিত। কাঁচা দুধের মত ছেলেকে তিনি সকল রকমের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া রাখিতে চান, টকিয়া যাইতে কতক্ষণ! উনুনে চাপাইয়া এক বলক উথলাইয়া লইতে পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। ভিতরে ভিতরে সরকার মশায়ের সঙ্গে মিলিয়া তিনি তাহারই চেষ্টা দেখিতেছিলেন। কিন্তু শহরের ডাকিনীরা যে দূর হইতেও মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে মফঃস্বলের বিধবা জমিদার-গৃহিণী তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই।

হেমন্ত টকিয়া গেল না বটে কিন্তু তাহার ভাল লাগিল। মুখটা মনে রাখিবার মত—আর একটু কাব্য-ভাবাপন্ন হইলে সে ভাবিত—বুকে রাখিবার মত। তথাপি পলিটিক্স ও টেনিসের ফাঁকে সে চোখ ও কানকে সজাগ রাখিল। নলিনী হইল সহায়।

সংবাদ যাহা সংগৃহীত হইল তাহা আশাপ্রদ নয়। কবিরাজ রামসদয় মুখোপাধ্যায় দরিদ্র রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, হেমন্তেরা বারেন্দ্র। নামে কবিরাজী করেন বটে কিন্তু মোদক বেচেন না বলিয়া উদরান্নের সংস্থান হয় না। স্বকল্যাণী তাঁহার কন্যা—দরিদ্র গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে যেমন হয়, বাড়ীতে একটু আধটু রামায়ণ, মহাভারত পড়ে, এবং তরকারী, রান্নাঘর, ভাঁড়ার এবং ভাইবোনের কাঁথা ও লেপ-বালিশ লইয়া ব্যস্ত থাকে। কলিকাতায় বসিয়া যতদূর 'অর্থডক্স' হওয়া সম্ভব মুখুজ্জে-পরিবার তাহাই; দ্বিপ্রহরে নিস্পুরুষ পাড়ায় চিক ফাঁক করিয়া এবাড়ীতে ওবাড়ীতে সুখদুঃখের কথা হয়, বেপরদা এই পর্য্যন্ত। সুতরাং সোজা রাস্তায় সুবিধা হইবে না।

শিকারে হেমন্তের খুব নাম, তাহার লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ এবং কোনও শিকার যদি একবার তাহার নজরের ভিতর আসিয়া পড়িত নিতান্ত বিপর্য্যয় ছাড়া তাহার আর পরিত্রাণের উপায় ছিল না; ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়াই হউক উদ্দিষ্ট লক্ষ্যকে ঘায়েল করার শিকারী এবং জমিদারী মনোবৃত্তি হেমন্তের জন্মগত।

দাদার মনোভাবের বিন্দুমাত্র আঁচ না পাইয়াও নলিনী বলিল, স্বকল্যাণী মেয়েটি চমৎকার—সারাদিন কেবল খাটছেই, মুখে রা নেই; সাজসজ্জার বাড়াবাড়ি নেই, অথচ কিরূপ!

এইবারে পলিটিশিয়ান হেমন্তের কূটনীতির পরীক্ষা হইবে। কান্নাকাটি, আব্দার, আত্মহত্যার ভয় প্রদর্শন অথবা অ্যাবডাকশন, ইলোপমেণ্ট, লোপাট—কোনটাই হেমন্তের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। এ পক্ষ ও পক্ষ কোনও পক্ষই জানিবে না, অথচ কাজ হাসিল করিতে হইবে। শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইলে নলিনীর সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এ পক্ষের বাধা বাধাই নয়, হেমন্তের ইচ্ছাই মায়ের ইচ্ছা, তা সে থাক্ রাঢ়ী-বারেন্দ্র অথবা ধনী-দরিদ্রের ভেদ। ফন্দীবাজ সরকার মশাইয়ের চোখে ধূলা দেওয়া অবশ্য কঠিন, সে বুড়া আবার ময়মনসিংহের কোন্ জমিদার-কন্যাকে আশ্রয় দিবার প্রায় পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া আনিয়াছে।

প্রথম দর্শনেই একদিনের অজ্ঞাতকুলশীল প্রতিবেশী কন্যার মুখশ্রীতে ভুলিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিবার প্রবৃত্তির মধ্যে শিকারী মনোবৃত্তি যতখানিই থাক্—পাঠকের বোধ হইতেছে ব্যাপারটা অত্যন্ত অসঙ্গত এবং অবিশ্বাস্য এবং একটু আনকন্‌ভেনশনাল যাঁহারা তাঁহারা বলিবেন গাঁজাখুরী। তাহা হইলে আমরা নাচার। অবিশ্বাস্য এবং অসঙ্গত বলিয়াই তো গল্প উপন্যাসের সৃষ্টি; সঙ্গত এবং বিশ্বাস্য ব্যাপার তো অহরহই ঘটিতেছে, তাহা লইয়া কিছু সৃষ্টি করা চলে না। একটা রাক্ষসে হরিণ সাজিল, রামচন্দ্র তাহার পিছনে ছুটিলেন, আর একজন রাক্ষস ভিখারীর বেশে রামচন্দ্রের স্ত্রীকে উড়াইয়া লইয়া গেলেন, রামচন্দ্র বানরদের সাহায্যে সাগরবন্ধন করিলেন—এই সকলই তো আপনারা বিশ্বাস করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনে যান; আমার লেখার তেমন কেরামতি থাকিলে একদিন গ্রে ষ্ট্রীটে রামসদয় মুখুজ্জ্যের ক্রুর কামানল মন্ত্রের তেজ দেখিতেও আপনাদিগকে যাইতে হইবে। তখন আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা উঠিবে না।

ম্যাজিক এবং পলিটিক্স—উভয় শিল্পকলাতেই একজন অ্যাসিষ্টাণ্ট প্রয়োজন। পলিটিশিয়ান হেমন্ত উৎপলের সাহায্য-গ্রহণ করিল। সে তখন কলিকাতায় ম্যাজিক ও ভেন্ট্রিলোকুইজম দেখাইয়া ছাত্রমহলে নাম কিনিয়াছে এবং ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে অভিনয়ে সাফল্য লাভ করিয়া নাট্যমন্দিরে ঘোরাঘুরি করিতেছে। উৎপলও স্পোর্ট—সে বিনা দ্বিধায় হেমন্তের সাহায্যে অগ্রসর হইল। এই গেল আমাদের নাটকের মুখবন্ধ। ইহার পর আর কয়েকটি দৃশ্যে ইহার সমাপ্তি। চরিত্র-পরিচয় মুখবন্ধেই দিয়াছি।

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিয়া উৎপল লাফাইয়া উঠিল—বিস্মিতও কম হইল না, কারণ হেমন্তের পক্ষে প্রেমোন্মাদ হওয়া—তথাপি স্পোর্ট ইজ স্পোর্ট। চট্ করিয়া কাগজ পেন্সিল লইয়া হিসাব করিয়া সে বলিল, পাঁচ-টাকা সাড়ে দশ আনা—এ টেনার উইল ডু, বের কর। হেমন্ত বাহির করিল। ঘণ্টাখানেক পরামর্শ চলিল।

পরদিন প্রাতঃকালে রামসদয় কবিরাজের বৈঠকখানায় তীক্ষ্ণনাসা সৌম্যদর্শন এক অবধূত সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল—ক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসাকাতর সন্ন্যাসী প্রবেশ করিয়াই এক ঘটি পানীয় জল প্রার্থনা করিলেন, সঙ্গে একমুষ্টি আতপ চাউল। ছেলেমেয়েরা ভিড় করিয়া উঠানের বারান্দায় দাঁড়াইল; কবিরাজ-গৃহিণী উঁকিঝুঁকি মারিলেন। চাউল চিবাইয়া জলপান করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, পরম পরিতৃপ্ত হলেম, বাবা। কিন্তু সময় তো তোমার ভাল যাচ্ছে না। রামসদয় প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, সবই তো জানতে পারছেন ঠাকুর! অচল হয়ে এসেছে।

সন্ন্যাসী হাসিলেন।—দরজাটা বন্ধ করে দাও।

ভিতরের দরজা বন্ধ হইল। এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে তাকে সারি সারি সজ্জিত বিচিত্র নামাঙ্কিত ঔষধের বোতলগুলির দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, ওই মকরধ্বজই খানিকটা দাও, ওতেই হবে। দরিদ্র কবিরাজ, স্বয়ং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে পারেন না; পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটের মত দানাদার 'মার্কে'র মকরধ্বজ খানিকটা বোতল হইতে বাহির করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, আমার হাতে দাও।

—এইবার ধর

বারোখানি চকচকে নূতন গিনি রামসদয় কবিরাজের মুঠার মধ্যে আসিতেই তাঁহার হাতটা অসহ্য দাহে জ্বালা করিতে

লাগিল, বুকটা গুরগুর করিয়া উঠিল। বিস্ময়ে ভয়ে অপলক গোলআলুর মত ড্যাবা-ড্যাবা চোখ ছুটিতে লোভে ও অবসাদে জল দেখা দিল। অকস্মাৎ গিনিগুলা ফরাসের উপর ছড়াইয়া দিয়া তিনি ব্যাকুলভাবে সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী অভয় দিলেন। বলিলেন, গিনিগুলো রাখ, ওতেই কদিন চলবে। কিন্তু এ ব্যবসা তোমাকে তুলে ছাড়তে হবে।

—আপনার আদেশ—

—অধীর হয়ো-না, বৎস, সব বলছি।

সাত দিনের মধ্যেই দেখা গেল, কবিরাজীর পুরাতন জীর্ণ সাইন বোর্ড অপসারিত এবং তাহার স্থলে চকচকে পিত্তল-ফলকে ও সজ্জিত কাষ্ঠফলকে অবধূত রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের নাম ও বশীকরণ, মারণ, উচাটন ইত্যাদির বিজ্ঞাপন। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অক্ষরে 'ক্রূর কামানল মন্ত্র' জল্ জল্ করিতে লাগিল।

প্রায় ভোরের দিকে হেমন্ত এদিক ওদিক চাহিয়া সুরুৎ করিয়া অবধূত রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। ভাল মানুষ রামসদয় চিনি চিনি করিয়াও ছোকরাকে চিনিতে পারিলেন না; জাল জুয়াচুরী জীবনে কখনও করেন নাই, নিতান্ত সরল বিশ্বাসে সন্ন্যাসীর কথামত কাজ করিতেছেন; উৎপলের ম্যাজিক এবং হেমন্তের জমিদারী তাঁহার অভাব ঘুচাইতেছে, কিন্তু তিনি জানেন, ইহা অবধূত সন্ন্যাসীর কৃপা সুতরাং এখনও মন্ত্রবিক্রয়ের কায়দাকানুনগুলা তেমন রপ্ত হয় নাই। থতমত খাইয়া প্রশ্ন করিলেন, কি চাই বাবা?

হেমন্তের লজ্জা করিতে লাগিল কিন্তু নাচিতে নামিয়া ঘোমটা দিলে চলিবে কেন? মাথা নীচু করিয়া প্রায় মরিয়া হইয়া বলিল, 'ক্রূর কামানল মন্ত্র' চাই প্রভু—হেমন্ত কবিরাজ-মহাশয়ের পা ধরিল।

—লক্ষ্য?

—একটি বালিকা।

—নাম গোত্র জানা আছে?

—আছে।

—বিবাহ, না—

—আজ্ঞে, ধর্ম্ম-বিবাহ।

একশত আট টাকায় কন্‌ট্রাক্ট হইল, বিফল হইলে মূল্য ফেরত। যজ্ঞ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইবে এবং লক্ষ্যের নাম ধাম গোত্র একটি ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া মাদুলীর মধ্যে ধারণ

করিলেই মন্ত্র অমোঘ ফল দিবে। প্রৌঢ় রামসদয় উৎপলের ম্যাজিকে অত্যধিক বিশ্বাসী হইয়াছিলেন বলিয়াই এতখানি অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন। তাঁহার মধ্যে কোনও পাপ ছিল না।

বাড়ী ফিরিয়া হেমন্ত একবার বুক ফুলাইয়া ওবাড়ীর দিকে চাহিল—হাসিতে পাইলে ভাল হইত; হাসি চাপিতে গিয়া হঠাৎ চোখ মারিয়া বসিল—সুকল্যাণী ছাদে ঘুঁটে তুলিতেছিল। সর্ব্বনাশ! হেমন্তের বুক ভয়ে হিম হইয়া আসিতেছে! একি করিল সে? যদি সুকল্যাণী হাসে অথবা পাল্‌টা চোখ মারে তাহা হইলেই তো সব পণ্ড; এই ব্যাপারের যবনিকা এখানেই ফেলিতে হইবে; চোখমারা এবং ফিরিয়া-হাসা মেয়েকে আর যাই করা যাক্—বিবাহ করা চলিবে না। ভগবান রক্ষা করিলেন, সুকল্যাণী ঘুঁটে ফেলিয়া ত্রস্তপদে নীচে পলাইল। হেমন্তের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। না, সিলেকশনে তাহার ভুল হয় নাই। সে ভারী আরাম পাইল।

যজ্ঞ সুরু হইয়াছে। দরজা জানালা বন্ধ। গরদের থান পরিয়া শুভ্র পৈতাধারী হেমন্তের কেমন অসোয়াস্তি বোধ হইতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, বল বাবা—

হেমন্ত বলিল—

চক্রসংস্থানরূপাস্থা বারাহী হৃদিভূষণঃ।
শুক্তাকরূণাদ্বৈত্যা মারণং ন চ মারণম্॥
সপ্তত্রিংশতি যোগিন্তরেকৈকস্ত তৎ সংযুতঃ।
সর্ব্বডাকিনী তৎখ্যাতা অন্যা চৈব মহদ্ভূতাঃ॥
তাশ্চ সর্ব্বা যথা ভূমি নাবোদ্দেশমিহার্ণবে।
শর্করী:ক্ষীরিকা স্নিগ্ধা মধুরা সর্ব্বকামদা॥

—লেখ বাবা, নাম ধাম গোত্র—

হেমন্ত লিখিল। শ্রীমতী সুকল্যাণী মুখোপাধ্যায়,…নং গ্রে ষ্ট্রীট, ভরদ্বাজ গোত্র। মুড়িয়া কবিরাজ মহাশয়ের হাতে দিতেই তিনি মাদুলিতে পুরিতে পুরিতে বলিলেন, বল—

দ্বাবিংশাক্ষরং হৃদয়ং ডাকিন্যা সহসম্পুটং।
ওঁ শ্রী ওঁ ব বজ্র হেড়া হেকি রুশীরূপে কং হং ভাহং কি
ফনীট জাট্ লট্ সংবাস্তহার হ্রূহ্রুং ফট্ স্বাহা॥

হাসি চাপিয়া রাখা কঠিন হইতেছে। হেমন্ত তথাপি উচ্চারণ করিল। যজ্ঞ শেষে একশত আট টাকা প্রণামী দিয়া হেমন্ত বিদায় লইল।

(শেষাংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়)

যে "সত্যি বলছি মশাই আপনার মত এমন খাঁটি লোক দেখিনি" এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া ফেলিল "কি খাঁটি চোখ মাইরি!" কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

প্রতিধ্বনি কি এতদিন পরে ফিরিয়া আসে? "সেই নীল নলিন নয়ন দুটি,—আঁখি তারকায় অমৃত পরশ..........!" যেন এতদিনে গভীর সমুদ্রবক্ষে! "খাঁটি চোখ!"

এই খাঁটি পর্বের শেষে উত্তরকাণ্ডে আহ্লাদচন্দ্র "বিল" হস্তে যে খাঁটি অভিনয় আরম্ভ করিবে, তাহা চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল; অতএব উদ্যোগ করিতে হইল; নানা গোপনীয় স্থান হইতে দৈবদোষের জন্য সাবধানতা যোগাড় করিয়া রাখিলাম। অনেক দিনের সঞ্চয়,—অনেক বৎসরের আহরণ।

যথাসময়ে আহ্লাদ "বিল" হস্তে উপস্থিত হইল; ৩০০ টাকা। প্রশ্ন করিলাম,—"আহ্লাদ, এমন খাঁটি জায়গা আর দেখেছ?" আহ্লাদ একেবারে গদগদ ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল—হুজুরের কাছে খাঁটি জিনিষ ছাড়া কিছু থাকতে পারে একথা বলে কোন্ শত্রুর সহোদর ভাই?"

"তবে আর বিলটা কাটব না। দাও, সবটাই মঞ্জুর করে দিলাম।" এই বলিয়া ৩০টি টাকাই হাতে তুলিয়া দিলাম।

বাজাইয়া দিলাম না। বাজাইল "আহ্লাদ।" ৩০টি টাকা আওয়াজ করিল প্রায় তিনশতবার। বাজাইবার শেষে আমার খাঁটি চোখের দিকে চাহিয়া রহিল প্রায় তিন মিনিট; "বলি-বলি-বলা-হোল না;" তারপর একেবারে সাষ্টাঙ্গে করিল এক দীর্ঘ প্রণাম;

এবং চলিয়া গেল।...প্রায় পাঁচ বছরের সঞ্চয়, সব খাঁটি সদ্গতি হইয়া গেল;

উলঙ্গ সত্য। জীবনের নিত্যস্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে;

ক্রুর কামানল মন্ত্র (৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

আরও দশ দিন পরে শুদ্ধ হেমন্ত রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিতেছে, জোচ্চুরির আর জায়গা পাননি মশায়! নালিশ করব আমি—

রামসদয় কবিরাজ এত সব ভাবেন নাই। অবধূত সন্ন্যাসী তাঁহার ভরসা; বলিলেন, অসম্ভব বাবা, এ হতেই হবে; তোমার ভুল হচ্ছে না তো!

—দেখুন, এ চালাকিতে আমি ভুলছি না।

কবিরাজ মহাশয় ফাঁপরে পড়িলেন। একি ব্যাপার! তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

'হর হর বোম বোম' ধ্বনির সঙ্গে দরজায় করাঘাত হইতে লাগিল। 'জয় গুরু' বলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কবিরাজ মহাশয় দরজা খুলিতেই অবধূত সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল;

সমস্ত শুনিয়া অবধূত বলিলেন, দেখি মাদুলি! হেমন্ত প্রস্তুত হইয়াই ছিল—উৎপলের হাতে মাদুলিটা দিল। ভুজ্জপত্র বাহির হইল। অবধূত চমকাইলেন। হেমন্তকে বলিলেন, তুমি একটু বাইরে যাও তো বাবা। হেমন্ত বাহির হইয়া গেল।

বিমূঢ় রামসদয় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন, অসম্ভব গুরুদেব, তা কেমন করে হবে?

—হতেই হবে বৎস, নইলে ব্যবসা ছাড়তে হবে, হয় তো মামলা-মোকদ্দমা—রামসদয় কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, এখন উপায়?

অবধূত বলিলেন, তোমার মেয়ে বলেই মন্ত্রে কাজ হয়নি, নইলে ও এতক্ষণ ছুটে বেরিয়ে যেত—

—সামাজিক গোলযোগ—

—অবধূতের সমাজ নেই বৎস!

শুকলাপী মুখ নীচু করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, ও আমি আগেই জানতাম। যে তোমার ডার্উিন! কিন্তু তুমি কাজটা ভাল করনি। আমার বড়ো বাবাকে নিয়ে—উনি যদি জানতে পারেন কখনো?

—তুমি পাগল হয়েছ শুক! আমি পাশের বাড়ীতে থাকি, আমাকেই চিনতে পারেননি, যেন উৎপলকে কখনও উনি চিনতে পারবেন না। উৎপল কিন্তু চিঠিটা বড় জোর হেঁকেছে।

প্রশ্ন করা উচিত হইবে কিনা শুকলাপী বুঝিতে পারিল না, তথাপি জোট্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি?

—'ক্রুর কামানল মন্ত্র' নিয়ে একটা নাটক লিখেছে, সেটা ছাপিয়ে দিতে হবে, নাট্যমন্দিরে অভিনয় করবে।

নলিনী বলিল, দাদার দরদই এই, কিন্তু তুই কি বল দেখি—যদি কবিরাজ মশাই রাজি না হতেন?

—তা কি হতে পারে ঠাকরুণ, তবে জন্য খেকেই লেখা আছে;

—তা হলে মন্ত্রটা?

—সত্যি।

মা কোনও দিনই ছেলের হদিস পান নাই, এবারেও পাইলেন না; সমস্ত ব্যাপারটা কিছুতেই তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে আনিতে না পারিয়াও তিনি বিরক্ত হইতে পারিলেন না। বউয়ের মুখখানি তাঁহার ভারী পছন্দ হইয়াছিল—যাকে বলে লক্ষ্মীমন্ত শুকলাপীর সমস্ত লক্ষণ ছিল তাহাই; তাইতো কিছুতেই বলা চলে না। তিনি শুধু নলিনীকে ডাকিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি বল তো নলি? হেমা এমন বেকা পথে গেল কেন? সোজাসুজি বললেই—

নলিনী বলিল, তুমি খেপেছ মামীমা, তাহলে কি দাদা কোনও কালে বিয়ে করত? ভাগ্যিস এই রকমটা হোল!

—কি জানি বাপু, বলিয়া মামীমা আর একবার নববধূর মুখখানি দেখিতে গেলেন। বেহাইয়ের লাঞ্ছনা, তাঁহার হইয়া ছেলেই কাঁদিয়াছে—এইজন্য অনুতাপ তাঁহার কোনও দিন যায় নাই; সরকার মহাশয় আজকালকার ছেলেদের একদম বিশ্বাস করিতেন না, তিনি মোটেই অবাক হইলেন না।

গুরু অবধূত সন্ন্যাসী অদৃশ্য; কবিরাজীর পুরাতন সাইনবোর্ডটা আবার যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয় আজকাল বাড়ীতেই স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতেছেন;

ভূত

"বনফুল"

এক

জনশ্রুতি, দেবরাজ ইন্দ্রই বজ্রধর।

কিন্তু জরাজীর্ণ বুড়া পিওনটাও যে বজ্র হানিতে সমর্থ তাহা সেদিন সকালে বোঝা গেল। সুষমার মস্তকে অনায়াসে সে একটি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া নির্বিকারচিত্তে চলিয়া গেল।

পত্রখানা হাতে করিয়া নির্ব্বাক সুষমা বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রশান্ত লিখিতেছে—

"আমার চিঠি পেয়ে তুমি কষ্ট পাবে জানি—কিন্তু তবু না লিখেও ত উপায় নাই। বিশ্বাস করো, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—কিন্তু বাবা, মা, ইন্‌টারকাস্‌ট বিয়ে দিতে কিছুতেই রাজী নন। এ অবস্থায় তাঁদের মনে কষ্ট দিয়ে বিয়ে করা অসম্ভব। যাঁরা আমাকে এত কষ্টে মানুষ করেছেন তাঁদের মনে এতবড় একটা আঘাত দিতে পারব না। তাঁদের আশীর্ব্বাদবঞ্চিত দাম্পত্য জীবনও কি সুখের হবে? কি করব বল—এ জীবনে আমাদের মিলন সম্ভবপর হল না। যদি পরজন্ম থাকে এবং সেই পরজন্মে যদি আমরা এক জাত হ'য়ে জন্মাই এবং এই জন্মের স্মৃতি যদি পরজন্মে জাগরূক থাকে তাহ'লে হয়ত আবার মিলন হবে।

তুমি রাগ কোরো না। আমার মনে যে কি হচ্ছে তা তোমায় বোঝাতে পারব না। আমার দুঃখের ভাষা নেই। এইটুকু শুধু সান্ত্বনা যে, তোমার জন্যেই আমি দুঃখ ভোগ করছি। দুঃখই প্রেমকে মহিমান্বিত করে। যদি সম্ভব হয় অল্প কয়েকদিন পরেই তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

ইন্দ্রের বজ্র কি ইহা অপেক্ষাও নিদারুণ?

দুই

কিন্তু নিদারুণতর আর একটি বজ্র উদ্যত হইয়াছিল।

সেটি পড়িল দুই দিন পরে।

সেই জরাজীর্ণ রোগা পিওনই সেটি ছাড়িয়া গেল।

প্রশান্তর বোন ও তাহার সহপাঠিনী মিনতির চিঠি মর্ম্মান্তিক চিঠি!

প্রশান্ত আত্মহত্যা করিয়াছে।

সূর্য্য-সমেত সমস্ত আকাশখানা সুষমার চোখের সম্মুখে দুলিতে লাগিল।

তিন

সুষমা মফঃস্বলের স্কুলে শিক্ষয়িত্রী।

বিস্তৃত স্কুল-কম্পাউণ্ডের একধারে তাহার ফ্রি কোয়ার্টার্স। সেই কোয়ার্টার্সে সুষমা ও আর একজন প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ বোস্ থাকেন। পাশাপাশি দুইখানি ঘরে দুইজনে শয়ন করেন। মাঝে একটি পরদাবৃত দরজা।

পত্রখানা পড়িয়া সুষমা বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।

গভীর রাত্রি

হঠাৎ সুষমা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

আলুথালুবসনা মিসেস্ বোস্ পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন।

ব্যাপার কি?

জানালায় কে যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিসেস্ বোস্ মেদবহুল চিবুকটা কুঞ্চিত করিয়া সন্দেহ করিলেন, নিশ্চয়ই সেক্রেটারী বাবুর বখাটে ভাইপোটা! ছোক্‌রার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার বহুদিন হইতে মিসেস্ বোসের বিরক্তির কারণ হইয়া আছে। অথচ হাতে-নাতে ছোকরাকে ধরিবার উপায় নাই। সঙীন ধূর্ত্ত!

সুষমা মিসেস্ বোসকে কিছু বলিল না।

সে কিন্তু স্পষ্ট দেখিয়াছিল।

প্রশান্তর ছায়া-মূর্তি।

অবিকল!

তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

চার

সুষমা খাট টানিয়া মিসেস বোসের ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইল কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই।

মিসেস্ বোসের শয়নঘর হইতে স্কুলের পিছন দিককার অশ্বত্থ গাছটা স্পষ্ট দেখা যায়। রাত্রে কি ভীষণ ঝাঁকড়া

নীচু ডালটায় বসিয়া কে যেন পা দোলাইতেছে।

দেখায় গাছটা! সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সুষমা সভয়ে দেখিল, ওই গাছটার নীচু ডালটাতে বসিয়া কে যেন পা দোলাইতেছে! অস্তমান চন্দ্রকিরণে ওই যে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

প্রশান্ত!

সুষমা শিহরিয়া চক্ষু বুজিল।

* * * * *

আর একদিন মনে হইল, বাগানের বেড়াটায় হেলান দিয়া সে যেন একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে!

তাহার চক্ষুতে ক্ষুধার্ত সে কি দৃষ্টি!

চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার।

পাশের খাটে শুইয়া মিসেস্ বোস নাক ডাকাইতেছেন। সুষমার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রশান্তের প্রেত-দৃষ্টি যেন টর্চের আলোর মত তাহার অন্তর বিদ্ধ করিতেছে।

সে সভয়ে চক্ষু বুজিয়া মনে মনে রাম-নাম জপ করিতে লাগিল।

আর একদিন সন্ধ্যার পর সে বেড়াইয়া ফিরিতেছিল।

গেটে ঢুকিতে যাইবে—মনে হইল, তাহার পাশ দিয়া সাঁৎ করিয়া সে চলিয়া গেল। হঠাৎ যেন গেটের পাশের ঝোপটায় মিলাইয়া গেল।

* * * * *

জীবিতাবস্থায় যে প্রিয়তম ছিল মরিয়া সে ভীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা হইলেই সুষমার গা ছম্ ছম্ করে!

পাঁচ

সেদিন ছুটি ছিল।

মিসেস্ বোস ছিলেন না—ছুটিতে বাড়ী গিয়াছিলেন। রাত্রে সুষমা ভাবিল করুণা দিদিকে (আর একজন শিক্ষয়িত্রী) পাশের কোয়ার্টার্স হইতে ডাকিয়া আনিবে। ডাকিতে গিয়া দেখিল, করুণা দিদির আপত্তি নাই—কিন্তু মেনুদির ঘোর আপত্তি। তিনি একা শুইতে পারিবেন না।

বাগানের বেড়াটায় হেলান দিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে।

নিরুপায় সুষমাকে চাকরটার উপর ভরসা করিয়া একাই শুইতে হইল।

গভীর নিশীথে ললাটে কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া সচকিতা সুষমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

হিমশীতল স্পর্শ!

ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, একেবারে শিয়রে বসিয়া আছে।

চীৎকার...ফিট্!

হঠাৎ সুষমা চীৎকার করিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে সুষমা চক্ষু মেলিল।

"ওরে, বাবারে—"

স্বয়ং ভূত জলের ছাপ্টা দিয়া তাহার মূর্চ্ছা ভাঙাইতেছে।

সুষমার গলায় কেমন যেন একটা ঘড় ঘড় শব্দ হইতে লাগিল। পেটের মধ্যে কি যেন একটা পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে। ভূত কিন্তু না-ছোড়!

ক্রমাগত জলের ঝাপ্টা দিয়া চলিয়াছে।

ছয়

পরদিনই সুষমা কাজে ইস্তফা দিয়া দিল।

গত্যন্তর ছিল না।

জিনিষপত্র গুছাইয়া অপেক্ষমান ট্যাক্সীটাতে গিয়া সে যখন উঠিল তখন তাহার মুখ লজ্জারুণরঞ্জিত।

"ছি-ছি-কি লজ্জা—"

স্বয়ং ভূত জলের ঝাপটা দিতেছে।

"বাবা-মার মত যখন পেয়েছি তখন আর কাকে ভয়? ট্রেণটা পেলে হয় এখন! তোমাকে একটু বাজিয়ে দেখ্ছিলাম আর কি!"

প্রশান্তর দুষ্টামিভরা চক্ষু দুইটি কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রশান্ত তাহা হইলে মরে নাই?

না। সে মিনতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া একটু রসিকতা করিয়াছিল মাত্র!

ভূত গাছে ফলে না।

মেগাফোন রেকর্ড

NEW RECORDS FOR OCTOBER 1937

J.N.G. 5157	দীনদয়াময়ী দুখহারিণী (ভজন) Prof. Jnanendra Prosad Goswami. মা, মা, বলে ডাকি কালী (ভজন)
J.N.G. 5158	তোমার রথের চাকা (ভজন) Sj Bhabani Ch. Das. আমার পাওনা দেনা (ভজন) —do.—
J.N.G. 5159	মেঘের কোলে চাঁদের রেখা গো (অর্কেষ্ট্রা সম্বলিত গান) Sm. Binapani Debi (Madhupur). এসে নিশি শেষে —do.—
J.N.G. 5160	কথা কয় রে দেখা দেয় না (ভাটিয়ালী) Kumari Chhabi Bhoumick (Amateur). আমার দুরন্ত প্রাণ —do.—
J.N.G. 5161	কৌতুক কথা—"জলতত্ত্ব" Prof. Abani Nath Nandi —do.— কৌতুক কথা ঐ (Dinajpur).
J.N.G. 5162	পিয়ানো ('এসে হেসে কাছে বসে'—সুর) Prof. Anukul Chandra Das. পিয়ানো ('আমার কেমন কমন করছে কেন মন'—সুর)

সাহিত্য-সম্রাট

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

"ষোড়শী"

প্রযোজক—দুর্গাদাস : সুর-শিল্পী—জ্ঞানদত্ত

J.N.G. 5148 to J.N.G. 5156

৯ খানি দু'ধারী রেকর্ডে সম্পূর্ণ

নিউথিয়েটার্স মেগাফোন রেকর্ড

শ্রীমতী কানন দেবী

J.N.C 5173	আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে 'মুক্তি হইতে তার বিদায় বেলার মালাখানি ঐ

এক সঙ্গে বসে' সবাই মিলে চা খেতে বেশ লাগে! মন খুসীতে ভরে' যায়—জগতের প্রতি তখন কারুর আর কোনো অভিযোগ থাকে না। জীবনের বোঝা যেন হাল্কা হয়ে যায়; মনে হয় বেঁচে সুখ আছে। প্রত্যেক বুদ্ধিমতী গৃহিণীই অবশ্য এ কথা জানেন; সেই জন্যই তাঁরা চা'কে তাঁদের পারিবারিক পানীয় বলে' গ্রহণ করেছেন। এতে তাঁদেরই কি কম আনন্দের কথা? পরিবারের সকলের সঙ্গে চা খেয়ে তাঁরা নিজেরাও কত সন্তুষ্ট।

চা প্রস্তুত-প্রণালী—টাট্‌কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজ্‌তে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

একমাত্র পারিবারিক পানীয়—ভারতীয় চা

IK 54.

বিনা খরচায় পূজার বাজার

....

না, ফিট হচ্ছে না...।

উহু...প্যাটানটা ভাল নয়

বলি, এক জোড়াও কি ভাল জুতো নেই ?

ধেৎ, এগুলো ভদ্দর লোকের নয়

না, আপনারা শুধু দোকানই রেখেছেন

না, এসব অচল

কি আর করি বলুন !

জুতো বলতে কিছু আপনাদের নেই !!

ত্রুটি

শ্রীপরিমল গোস্বামী

তাহাকে সত্যই ভালবাসিয়াছিলাম এবং সেও আমাকে ভালবাসিয়াছিল। কথাটা এতদিন প্রকাশ করি নাই, তাহার কারণ আছে। আমি সংসারে অনেক কঠিন কঠিন কাজ করি একথা আপনারা জানেন। বড় বড় সভায় সভাপতি হই; শিক্ষাপ্রচার লইয়া আন্দোলন করি; মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্যবিভাগ লইয়া প্রায়ই সমালোচনা করি; বিদ্যুতের আলো সরবরাহ করিয়া ইলেকট্রিক কম্পানি কিরূপ লাভবান হইতেছে তাহার হিসাব করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ রেট সম্বন্ধে উপদেশ দেই; টেলিফোনের দাম কমান যায় কিনা এ বিষয়ে গবেষণা করি; দৈনিক পত্রিকাগুলি কি রীতিতে চলিলে দেশের কল্যাণ হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করি; ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করি; কমার্শিয়াল আর্ট এদেশে কিরূপে জনপ্রিয় করা যায় সে বিষয় আলোচনা করি; ট্রাম কম্পানির সঙ্গে বাস্ কম্পানির প্রতিযোগিতা স্বাস্থ্যকর কিনা সে বিষয়ে আমার মত আপনারা জানেন; ধোঁয়া সমস্যা শহর জীবনের পক্ষে সমাধানযোগ্য কিনা এবং কি করিলে ভারতীয় সিনেমাশিল্প ভারতীয় বেকার সমস্যা ঘুচাইতে পারে সে বিষয়ে আমার মত অত্যন্ত স্পষ্ট; ভেজাল ঘি এবং ভেজাল সাহিত্য এ দেশে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহাও আমার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইহা ছাড়া বহু আধ্যাত্মিক বিষয় আমার গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

তথাপি আমি ভালবাসিয়াছিলাম। কথাটা বলি নাই, কারণ আপনারা আমার দিকে সাধারণতঃ ফিরিয়া চাহেন না, কিন্তু আমি প্রেমে পড়িয়াছি শুনিলে সর্বদা আমার দিকে চাহিয়া থাকিতেন, এবং ক্রমাগত ভাবিতেন, আশ্চর্য্য! এই লোকটা প্রেমে পড়িয়াছে! ইহাকে দেখিয়া ত সে রকম মোটেই মনে হয় না! সংসারে তাহা হইলে ত অসম্ভব কিছুই নাই!—অর্থাৎ আপনারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে হঠাৎ অত্যন্ত সাধু সাজিয়া আমার দিকেই চাহিতেন, দয়া করিয়া একবার নিজেদের দিকে চাহিতেন না।—কিন্তু সে কথা যাক্।

আমি ভালবাসিয়াছিলাম এবং ভালবাসা পাইয়াছিলাম। আমি যে ভালবাসিয়াছিলাম তাহা আমার কাছে প্রথম ধরা পড়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে। বিশেষ একটি প্রয়োজনে শ্যামবাজার যাইতে হইবে। বেলা তিনটার সময় কাজ, পৌণে তিনটার সময় বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটের মাথায় দাঁড়াইয়া আছি ট্রামের জন্য। হ্যারিসন রোডের দিকে চাহিয়া দেখি ট্রাম দেখা যায় না। সেই ক্ষণঅবসরে তাহারই কথা মনে আসিল। তাহার আসল নাম বলিব না, বলিলে তাহার দুর্দ্দশা বাড়িবে, যদিও তাহাতে এখন আর আমার আপত্তি নাই।

ধরিয়া লওয়া যাক্, তাহার নাম পুঁটু। বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া এই পুঁটুর কথাই মনে আসিল। পুঁটু আমার সমস্ত সত্তা জুড়িয়া বসিয়াছে; অথচ আমিই ব্যাপারটা জানি না! কিন্তু ট্রাম কৈ? আধঘণ্টা দাঁড়াইয়া আছি একখানা ট্রাম নাই! শ্যামবাজারের জরুরি কাজটা আর করা হইল না। ট্রাম কম্পানির বিরুদ্ধে মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পাশে দু'জন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন, তাঁহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ট্রাম চল্‌ছে না কেন—কোনো দুর্ঘটনা—"

একজন ভদ্রলোক বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সে কি মশাই, আপনার সুমুখ দিয়ে এ পর্য্যন্ত অন্ততঃ সাতখানা ট্রাম চলে গেছে—ঐ দেখুন শেষ গাড়িখানা এখনও মাণিকতলা পাস্ করেনি।"

তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম। একটি চায়ের দোকানে বসিয়া চা খাইতে খাইতে মনকে সোজা প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, "বলি ব্যাপার কি?" মন হাসিয়া বলিল, "আর কি!—পুঁটু!"—বুঝিলাম পুঁটু মন জুড়িয়া বসিয়াছে, ট্রাম কম্পানি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। বুঝিবার পর হইতে পুঁটুকে আর ছাড়িলাম না। ধীরে ধীরে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল।

আজ অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। কঠিন প্রস্তরখণ্ড একের পর আর বসাইয়া যেমন মিশরের পিরামিড প্রস্তুত হইয়াছে ঠিক তেমনি দৃঢ় ভিত্তিতে, সুনিশ্চিত হাতের গঠন-

আর কি!- পুঁটু

নৈপুণ্যে আমাদের প্রেমের পিরামিড মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছিল। পুঁটু আমার জন্য কত বিপদ, কত নিন্দা, কত গঞ্জনা সহ্য করিয়া আমার সুখ এবং দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। যখন আমি অস্থায়ী প্রেমের ব্যর্থ মালা গাঁথিবার নিষ্ফল প্রয়াসে মাতিয়াছিলাম, যখন আমার এবং আমার বান্ধবীদের প্রাণের কথা প্রকাশ করিবার ভাষা সিনেমা হইতে সংগ্রহ করিতে হইত, সেই সময় পুঁটুর আবির্ভাবে সেই মালা ছিন্ন এবং সেই ভাষা নীরব হইয়াছিল। সে যে আমার এবং আমি যে তাহার একথা আমরা উভয়ে উভয়ের চোখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতাম, কোনো ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না। আমাদের এই ভালবাসা বীজের মত নীরবে অঙ্কুরিত হইয়া উন্মুক্ত আলো-হাওয়ায় বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বহু শাখা-প্রশাখায় এবং পত্রে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল, বাকী ছিল ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়া।

সামান্য একটু ইঙ্গিত, সামান্য একটু স্পর্শ, সামান্য একটু সান্নিধ্য—এই ছিল আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। পুঁটু এই ইঙ্গিতের সাহায্যে অনেক কথাই বলিয়াছিল। তাহার সহিত অনেকদিন সান্ধ্যভ্রমণ করিয়াছি; বেড়াইতে বেড়াইতে সে আমাকে কতদিন ম্যারিজ রেজিষ্ট্রেশন অফিসের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। সেখানে কখনো তাহার আদরের বিড়াল, কখনো কর্পোরেশন, কখনো এয়ারোপ্লেন সম্বন্ধে কত আলাপ করিয়াছে, তারপর উভয়ে বিদায় লইয়াছি। বিবাহের কথা সে কখনো মুখে বলে নাই, কিন্তু এই সব ব্যাপার হইতে আমি তাহার মনের ভাব কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

মনে পড়ে তাহার সঙ্গে একদিন 'হোয়াইট এঞ্জেল' নামক একখানি সিনেমা-ছবি দেখিয়াছিলাম। দেখা শেষ হইলে পথে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "নাইটিঙ্গেলের জীবনই কি মেয়েদের পক্ষে আদর্শ জীবন ?"

ছবিটা দেখিয়া আমি নাইটিঙ্গেলের প্রতি শ্রদ্ধায় গদগদ হইয়া উঠিয়াছিলাম, হয়ত সেই জন্যই বলিতে যাইতেছিলাম, "নাইটিঙ্গেলের আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ কোনো মেয়ের পক্ষে আছে কি না জানি না"—কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করিয়া বলিয়াছিলাম, "সব মেয়ের পক্ষে নয়; সংসারে এমন এক একজন মেয়ে বা পুরুষ আবির্ভূত হয় যে অন্য কারো সঙ্গে মেলে না, যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যে নিজের পথ নিজে কেটে চলে"—ইত্যাদি।

পুঁটু বলিয়াছিল তাহারও সেই রকম মনে হয়, এবং বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিল। সেই নিশ্বাসটি আজিও আমার মর্ম্মে বিঁধিয়া আছে।

নাকে আমার—

একদিন সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমাদের এই যে বন্ধুত্ব, এটা কি সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিত নয় ?" আমি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলাম, এখনো সময় হয় নি।—ডিমের মধ্যে যে

কোমল অংশ থাকে তাকে কঠিন খোলস দিয়ে কিছুকাল রক্ষা করতেই হবে; কোমল অংশের সেই গোপনীয়তা নিন্দনীয় নয়, সেটা আকস্মিক।" পুঁটু কথাটা মানিয়া লইয়াছিল।

এইভাবে চলিতে চলিতে হঠাৎ পুঁটু আমার কাছে আসা একেবারে বন্ধ করিল। প্রতিদিন তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকি; এক একটি দিন বৃথা চলিয়া যায়, মনের মধ্যে অভিমান ঘনাইয়া উঠিতে থাকে। একদিন দুইদিন করিয়া প্রায় সাত দিন কাটিয়া গেল তবু পুঁটুর সাক্ষাৎ নাই! অসুস্থ হইলে একখানা চিঠি দিয়া জানাইতে পারিত, অন্য কোনো বিপদ হইলেও আমিই আগে জানিতে পাইতাম, তবে পুঁটুর কি হইল? দরজায় কড়া নাড়া শুনিয়া বুক কাঁপিয়া ওঠে—অতি আনন্দে লাফাইয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দেই, কিন্তু হায়! পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমার দরজার কড়া নাড়ে, কেবল পুঁটু নাড়ে না!

এইভাবে অভিমান-ক্ষুব্ধ হইয়া সাতদিন কাটাইবার পর পুঁটু একদিন সত্যই আসিল। এবং আসিয়াই তাহার স্নিগ্ধ হাসিতে ঘর আলোকিত করিয়া বলিল, "আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে।"

আমি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিয়ে! কে ঠিক করলে?"

পুঁটু সহজভাবে বলিল, "আমি নিজেই।"

আমি মনটাকে দৃঢ় করিয়া বলিলাম, "পুঁটু আমার একটা কথা ছিল—"

পুঁটু বলিল, "তা জানি। কিন্তু হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেল। অদ্ভুত তাঁর নাকের গড়ন।—তোমার নাকের চেয়ে ঢের ভাল, একশ গুণে।—এমন নাক আমি ছাড়তে পারি না, তা ছাড়া তিনিও আমার চুল দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।"

আমার হৃদয় বেলুন হইতে মুহূর্তে সমস্ত হাওয়া বাহির হইয়া গেল। সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর ঘৃণায় মন জ্বলিয়া উঠিল; প্রতারক, শঠ, অবিশ্বাসী—

পুঁটু চলিয়া গেল।

আমি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর গিয়া আয়না লইয়া বসিলাম।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম নাকে আমার সত্যই কিছু ত্রুটি আছে।

স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য্য ও মিতব্যয়িতা

এই তিনটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

সালিমার পেণ্টস্

ব্যবহার করুন

ইহা ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সালিমার পেণ্ট, কলার এণ্ড ভার্ণিশ কোং লিঃ

৬ নং লায়ন্স্ রেঞ্জ, কলিকাতা

এস, পি, ১৫

ভুটিয়া রমণী

১। কুমারী উষা শীতলবাদ—নিখিল ভারত চিলড্রেন্স এসোসিয়েশনের মুখপত্র "পুষ্পে"র সহ-সম্পাদিকা। সম্প্রতি তিনি ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

২। কুমারী কলাবন্তী বাথেয়া—ভারতীয় শুল্ক বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুক্ত এইচ, আর বাথেজার কন্যা। বিহার ও উড়িষ্যার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কুমারী বাথেজা বিশেষ সুপরিচিতা।

৩। শ্রীমতী কমলা ধিঙ্গরা—শিক্ষিতা মহিলাদের ছায়াছিত্রে যোগদানের পক্ষপাতী। এজন্য তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীমতী কমলা লাহোর মহিলা ডিগ্রি কলেজের লেক্‌চারার।

৪। শ্রীমতী পার্ব্বতী টি গিদওয়ানী—নিখিল ভারত চিলড্রেন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট। সম্প্রতি ইনি বোম্বাইয়ে তাঁহার সমিতির কার্য্যাবলী প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাণী মা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার মেয়ে বাণী। পাঁচ পার হইয়া সবে সে ছয়ে পা দিয়াছে। হঠাৎ তাহার জীবনে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সে পাকা গিন্নী হইয়া উঠিল। সংসারের সকলেই আমাকে সে জন্য দায়ী করিলেন—বলিলেন, বাপের আদরেই মেয়েটির মাথা খাওয়া গেল।

বিবরণটা এই। বাণীর আগে আমার আর একটি মেয়ে হইয়াছিল—কালো মেয়ে, একটি চোখ ট্যারা, তার নাম দিয়াছিলাম 'বুলবুল'। বুলবুল শেষে সংক্ষিপ্ত হইয়া বুলুতে পরিণত হইয়াছিল। সেই বুলু অকস্মাৎ একদিন চলিয়া গেল। প্রথমটা সে আঘাতে পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলাম। এখনও মধ্যে-মধ্যে মনে হয়, অপূর্ব্ব সে আঘাত। মানুষ যে কতখানি ভালবাসিতে পারে শোকের নির্ম্মম আঘাত না পাইলে সে উপলব্ধি করিতে মানুষ পারে না। নারিকেলের ছোবড়া ও খোলার মত হৃদয়ের আবরণটা না ভাঙিলে অন্তঃস্থলের শস্য এবং পানীয়ের অমৃতরসের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কিন্তু শোক চিরদিন থাকে না। চিরদিন কেন, শোক বোধ করি সুখের চেয়েও স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। শোক আস্বাদে অতি তীব্র কিন্তু অপূর্ব্ব, তাহার ফল অতি পবিত্র। শোক মানুষকে উদার করে, পঙ্কিল হীনতার লোক হইতে ঊর্দ্ধে লইয়া যায়। তাই শোক স্বল্পদিন স্থায়ী। মানুষ টানিয়া টানিয়া শোকাহতকে নীচে নামাইয়া আনে। প্রকৃতিও পরিহাস করিয়া তাহাকে নিম্নলোকে ঠেলিয়া দেয়। আমাকে যে অত্যন্ত সবলে শোকের রাজ্য হইতে টানিয়া নীচে নামাইল সে ওই বাণী।

বাণীর বয়স তখন সবে চার বৎসর। বুলুর অদর্শনে সে কাঁদিল, কিন্তু আমার কান্না তাহার সহ্য হইল না—সে আমার কোলে আসিয়া চাপিয়া বসিল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সঙ্কোচ ভরেই ডাকিল, বাবা!

ডাকটি বড় মিষ্টি লাগিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াও ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দিলাম—মা!

—আমার কি নাম, বাবা?

বুলবুলের নাম দিয়াছিলাম-বুলবুল-তুলতুল-ফুলফুল টুলটুল ইত্যাদি। ছড়াটা অনেক বড় ছিল কিন্তু বুলবুলের স্মৃতির সহিত সে ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। বাণী অভিমান করিয়াছিল, সুতরাং তাহারও নাম রচনা করিতে হইয়াছিল। বাণী সেই নামের ছড়া শুনিতে চাহিল।

আমি বলিলাম, বাণী মা, রাণী মা, মণি মা, ধনি মা, চাঁদিমা-রাঙিমা, লালিমা, নীলিমা, মহিমা-গরিমা, সুরমা-সুষমা মাসীমা-পিসীমা-মাগো-মা-মা! সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম।

সে আমার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—কাঁদিস্ না, কাঁদিস্ না! যে মেরেছে তোকে, আমি মারব তাকে!

সেই দিন হইতে সে আমার মা হইয়া উঠিয়াছে।

সতীন্ শব্দের অর্থ সে নিশ্চয় জানে না—কিন্তু আমার মাকে বলে সতীন্। কথাটা আমিই শিখাইয়াছি। অর্থ না জানুক কিন্তু মা আমার মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত তাহার সন্তানের দাবী লইয়া ঝগড়া করেন—সে জন্য সে সতীনের মতই মায়ের ঈর্ষা করে।

যদি জিজ্ঞাসা করি—বাণী মা, বাড়ীর মধ্যে দুষ্টু কে?

সে এদিক-ওদিক দেখিয়া চুপি চুপি বলে—ঠাকুমা।

যাক এত সব খুটিনাটির কথা। সে ঈর্ষা তাহার দিন দিন বাড়িতেছে। সে ঈর্ষা বাড়িয়া এখন এতদূরে উঠিয়াছে যে, সে এখন সংসারের কর্ত্রীর পদ দাবী করিতেছে। ফ্রক সে পরে না, কাপড় পরা চাই, আঁচলে চাবী বাঁধা চাই, মাথায় অল্প ঘোম্টা টানিয়া সে আমার মায়ের প্রত্যেক কর্ম্মটি অনুকরণ করে। বাহিরে কোন জিনিষ পড়িয়া থাকিলে সে তৎক্ষণাৎ সেটাকে টানিয়া এমন স্থানে রাখিয়া দেয় যে খুঁজিয়া বাড়ীর লোক সারা হইয়া যায়। বাণীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, আমি তুলে রেখে দিয়েছি! এমনি করে কি ফেলে রাখে! যদি কেউ নিয়ে যেত!

বলিয়া সে আরও কত কথা বলিতে বলিতে আপন খেলা ঘরে গিয়া আপনার আঁচলের চাবী দিয়া ঘরের দরজা খোলে—কুটুস-কুলুপ! তারপর সেটাকে বাহির করিয়া আনে। এই খেলাঘর যে তাহার কয়টা তাহার হিসাব কেহ জানে না। আর স্থান পরিবর্ত্তন তো অহরহ হইতেছে।

সেদিন বাড়ির মেয়েদের নিমন্ত্রণ ছিল এক বিবাহ বাড়িতে। মা বলিলেন—বাবা, বউমা'র গহনার বাক্সটা যে বের ক'রে দিতে হবে।

বাহির করিয়া দিলাম। বাণী চীৎকার আরম্ভ করিল—আমার গয়না?

আমার মা তাঁহার নিরাভরণ মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, তুই যে বলিস্ তুই আমার সতীন—তোর বাপের মা—তুই গয়না পরবি কি? আমি গয়না পরেছি? আমার সতীন হ'য়ে গয়না পরবি কি তুই?

সে তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—আমি সতীন হব না। অতঃপর গহনা বাহির না করিয়া দিয়া উপায় রহিল না।

* * * * *

সন্ধ্যায় বাড়িতে আসিয়া দেখি—হুলুস্থুল কাণ্ড। বাণী

কাতরভাবে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে—আর বাড়ির সকলেই বলিতেছে—ওর বাপই আদর দিয়ে ওর মাথাটি খেলে !

ব্যাপার শুনিলাম, বাণীর মা বিবাহ-বাড়ি হইতে আসিয়া আপনার ও বাণীর গহনাগুলি খুলিয়া বাক্সতে বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়াছিলেন। সেই গহনার বাক্স অকস্মাৎ এক সময় অন্তর্হিত হয়। বাড়ির সমস্ত লোক যখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে—তখনই বাণী কোথা হইতে আসিয়া নিজের মাকে বলে—তোমার কাণ্ড বটে মা! এমনি করে গয়নার বাক্স না কি—?

আর যায় কোথা—গহনা-শোক-বিহ্বলা বাণীর মা আসিয়া তাহার পিঠে দুম্‌দাম্‌ শব্দে কিল-চড় বসাইয়া দিয়াছে। গহনার বাক্স অবশ্য পাওয়া গিয়াছে।

বাড়িতে সমালোচনার আর অন্ত ছিল না—তখনও পর্য্যন্ত মেয়েটিকে কেহ স্নেহ-সম্ভাষণ করে নাই। সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল—আমাকে দেখিয়া হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমার এ দৃশ্যটা অত্যন্ত নির্ম্মম বলিয়াই মনে হইল—আমি রাগ করিয়াই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম।

মা বলিলেন—আর আদর দিয়ো না বাবা, শাসন করা একটু দরকার।

ঘোমটার মধ্য হইতে বাণীর মা বলিলেন—ওই তো আদর দিয়ে মাথাটি খেলে!

আমি কোন কথা না বলিয়া বাণীকে বুকে করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার বাড়িতে ফিরিতেই মা বলিলেন—গহনার বাক্সটা যে সিন্দুকে তুলে রাখতে হবে বাবা!

আমার মনের ক্ষোভ তখনও মেটে নাই। আমি বলিলাম, আমি পারব না!

মাও এবার রাগ করিয়া উঠিলেন—না পার, নাই পারবে বাবা! যায় তোমাদেরই যাবে।

ঘরের ভিতর হইতে বাণীর মা বলিলেন, মেয়ে আর কারও হয় না, ছেলেপিলে আর কারও মরে না! সে তো আমারও সন্তান ছিল, না—একা ওরই ছিল!

উগ্র ক্রোধ প্রাণপণে দমন করিয়া বসিয়া রহিলাম—কোন উত্তর দিলাম না। বাণী এতক্ষণে শান্ত হইয়াছিল—সে আপন মনেই ঘুরিয়া খেলা করিতে লাগিল। বাণী শান্ত হইল—কিন্তু তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বাড়িতে যে ঝটিকাবর্ত্ত উঠিয়াছিল তাহা শান্ত হইল না। শিশুতে এবং বয়স্কতে এই খানেই পার্থক্য। এমন কি, বাড়িতে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত হইল না—রাগ করিয়া মা শুইতে চলিয়া গেলেন। একই বিছানায় নির্ব্বাক হইয়া আমরা স্বামী-স্ত্রীতে শুইয়া রহিলাম। বাণী কিছুতেই মায়ের দিকে শুইল না। আমার পাশে আসিয়া সে আবার ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

* * * * *

ঘটনার পরিণতিটা এতদূর আসিয়া যদি সমাপ্ত হইত তবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতাম। নির্ম্মম ভাগ্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর পরিহাস করিবার জন্যই এমনি ক্রোধান্ধ করিয়া সমগ্র সংসারটিকে শোচনীয় পরিণামের পথে চালিত করিতেছিল। আমরা বুঝিতে পারি নাই।

সকালেই দেখা গেল, চোরে ঘরে সিঁধ কাটিয়াছে। মাটির ঘরেই কাপড়ের বাক্স-পেঁটরা থাকে, সেই ঘরে সিঁদ কাটিয়া চোরে বাক্স-পেঁটরা তচনচ্‌ করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়াছে।

স্ত্রী বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন! গহনার বাক্সও যে কাপড়ের বাক্সের উপরেই ছিল! গত রাত্রের অশান্তির তাড়নার ফলে তিনি রাগ করিয়া বাক্সের উপরেই গহনার বাক্স ফেলিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন।

মা বলিলেন—ওগো—আমার বুক যে কেমন করছে গো! ও মাগো!

আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম।

পাড়া-প্রতিবেশী আসিয়া আমাকেই দোষ দিল। রাগ করিয়া এত টাকার গহনা বাহিরে রাখিয়া দেওয়া আমার উচিত হয় নাই, আর গহনা গহনা করিয়া এতটা গোলমালের পর। আবার এতটা চেঁচামেচি যদি না হইত তবে এমন হইত না। ঘরের লোকে—চাকর-বাকরেই কেহ না কেহ সন্ধান দিয়াছে। আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

মা বলিলেন—ওই মেয়েটি অত্যন্ত কুলক্ষণা! ওর থেকেই এই হ'ল।

পাড়া-প্রতিবেশীরা সায় দিল—একজন বলিল—ওরই দৃষ্টি-দোষে সে মেয়েটা গিয়েছে!

একজন বলিল—সে আর কি করবে বল! এখন পুলিশে খবর দাও।

হাঁ-মনে ছিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহির হইলাম।

—বাবা!

দারুণ দুর্দ্দান্ত ক্রোধে আমার অন্তরটা সারা হইয়া উঠিল। সকল অনর্থের মূল ওই অলক্ষণা মেয়েটা আবার পিছন ডাকিতেছে! ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

বাণী পিছনের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল—গহনার বাক্স আমি রেখে দিয়েছি বাবা! মায়ের যে কাণ্ড—!

১৯ পৃষ্ঠায় ইহার শেষ অংশ দেখুন

রদেনষ্টাইনের অধীনে দেড় বৎসর ইউরোপীয় 'প্রাচীর-চিত্রাঙ্কন' পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে 'ইণ্ডিয়া হাউসে'র দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন ক'রে তাঁরা সকলেই প্রচুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। দেশে ফিরে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের শিল্পোন্নতির কাজে লাগাচ্ছেন। এই সব ইউরোপ-প্রত্যাগত শিল্পীদের মধ্যে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ ও সুধাংশু চৌধুরীই বাংলাদেশে 'প্রাচীর-চিত্রাঙ্কনে'র কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। বর্ত্তমানে জনসাধারণের মধ্যেও 'প্রাচীর-চিত্রের' প্রতি একটা আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের পাঠাগারের তিন-দিকের দেয়ালেই 'প্রাচীর-চিত্রাঙ্কন' করিয়েছেন। শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ এই সুবৃহৎ কাজ অতি যোগ্যতার সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন। প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের সমগ্র ইতিহাস এই চিত্রের বিষয়-বস্তু ছিল। বর্ণ-বিন্যাস, সাবলীল রেখা-ভঙ্গিমা, বিষয়-বস্তুর বিজ্ঞানসম্মত স্থাপনার দ্বারা ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দেওয়ালে যে অপূর্ব্ব চিত্রাঙ্কন করেছেন তা চিরকাল বাংলার গৌরব-স্বরূপ হ'য়ে থাকবে।

কলিকাতার সিনেমা-গৃহগুলি বর্ত্তমানে তাদের রূপ-শয্যার অঙ্গ হিসাবে 'প্রাচীর-চিত্রের' আদর করছে। শিল্পী সুধাংশু চৌধুরী মহাশয় মেট্রো, চিত্রা, প্রভৃতি সিনেমা-গৃহের 'প্রাচীর-চিত্রাঙ্কন ক'রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে তাঁর অঙ্কিত কয়েকখানি প্রাচীর চিত্রের নমুনা ছাপা হল। পাঠকেরা এই ছবিগুলি থেকে বর্ত্তমান বাংলার প্রাচীর চিত্রের একটা ধারণা ক'রে নিতে পারবেন।

বাণী মা

১৫ পৃষ্ঠার শেষ

—কোথায়? কোথায়?

—সেই চান-ঘরের পাশে চোরকুঠরীতে আমার খেলা ঘরে! কুলুপ দিয়ে—। তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে তুলিয়া বলিলাম—কই, বের ক'রে দেবে চল তো মা!

সে বলিল—সেই মা যখন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল তখনই আমি দেখলাম। দেখে—বলি সামলিয়ে রেখে দিই!

খেলাঘরেই বাক্সটি দেখিলাম। তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইতে গেলাম—কিন্তু বাণী বাধা দিয়া বলিল, দাঁড়াও কুলুপ খুলি!

বলিয়া সে শূন্যে চাবী ঘুরাইয়া—মুখে শব্দ করিল—কুটুস—কু লুপ—!

আজ ১০ বৎসর—
সেনোলার
রেডিও সেট
রেডিও গ্রামো
এমপ্লিফায়ার
সহর ও পল্লীতে

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। সমস্তই বিলাতী সরঞ্জাম—সুর ও সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, দাম খুবই কম।

আজই অনুসন্ধান করুন।

সেনোলা রেডিও সেট ৩টী ভাল্‌ব ডি, সি. মেন - ৯০৲ টাকা হইতে
সেনোলা রেডিও সেট ৩টা ভাল্‌ব ব্যাটারী সেট—১৩০৲ হইতে ব্যাটারী সমেত।

সোল ডিষ্ট্রিবিউটর্স্ ঃ—আমেরিকার জি, ই, সেটের

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স
১১নং এসপ্ল্যানেড, ২১নং চৌরঙ্গী
(লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়ে)

বিজ্ঞপ্তি

৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষে 'সচিত্র ভারত' দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। ২০শে অক্টোবর অফিস খুলিবে এবং ২৩শে অক্টোবর হইতে নিয়মিতভাবে "সচিত্র ভারত" প্রকাশিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
সচিত্র ভারত

আধুনিক বাংলার 'প্রাচীর-চিত্র'

শ্রীসুধাংশু রায়

আধুনিককালে বাংলাদেশে 'প্রাচীর-চিত্র' অঙ্কনের গোড়া পত্তন করেন শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথ যখন কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ, তখনই তাঁর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। আর্ট স্কুলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই নূতন শিল্পটীর সাধনা আরম্ভ করেন। তাঁর ছাত্রেরা এই বিদ্যা কতখানি আয়ত্ত করেছিল, এখন আর তার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে অবনীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-অঙ্কিত একখানি 'প্রাচীর-চিত্র' এখনও কলিকাতার আর্ট স্কুলে সযত্নে রক্ষিত আছে। বাংলার এই প্রথম 'প্রাচীর-চিত্র'খানির বিষয়-বস্তু 'কচ ও দেবযানী'। অবনীন্দ্রনাথের কচ ও দেবযানীর যে জলরং চিত্রখানি প্রসিদ্ধ—এটী তারি অনুকৃতি। সাদা আল্‌গা টাইলের উপর এখানি আঁকা হ'য়েছিল। তারপর অবনীন্দ্রনাথ নিজে বা আর কেউ অনেককাল এদিকে বেশী কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেননি। এর পরের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে হয়। বিশ্বভারতীর শিশু-ভবন, গ্রন্থাগার, সিংহ-ভবন, পাকশালা প্রভৃতি গৃহের দেওয়ালে ছাত্রদের দ্বারা এবং নিজের প্রচেষ্টায় তিনি বহু 'প্রাচীর-চিত্র' জয়পুরী ও ইটালীয় প্রথায় অঙ্কিত করিয়েছেন। জয়পুরের একজন অভিজ্ঞ পটুয়াকে শান্তিনিকেতনে আনিয়ে, তার কাছ থেকে এঁরা জয়পুরী প্রথার সব 'আট্‌-ঘাট্‌' জেনে নিয়েছেন। যাই হ'ক দেওয়ালের উপর সরাসরি চিত্রাঙ্কনে আধুনিক বাংলায় শান্তিনিকেতনই পথ দেখিয়েছে।

বাংলার 'প্রাচীর-চিত্রের' ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ছয়-সাত বৎসর পূর্ব্বে। বিলাতের 'ইণ্ডিয়া হাউসের' রূপ-সজ্জার জন্য চারজন বাঙ্গালী শিল্পীকে ভারত সরকার লণ্ডনে নিয়ে যান। তাঁদের ইউরোপের বড় বড় সহরের সমস্ত ভাল ভাল 'প্রাচীর-চিত্র'গুলি দেখিয়ে আনা হয় এবং লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব্‌ আর্টস্‌এর অধ্যক্ষ

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে দেওয়াল-চিত্রাঙ্কনরত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ ও তাঁহার ছাত্রবৃন্দ। পশ্চাতে অশোকের রাজসভার দৃশ্য।

বনানী

শ্রীসুধাংশু চৌধুরী-অঙ্কিত প্রাচীর-চিত্র হইতে

ময়ূর-ময়ূরী

লামা

শ্রীসুধাংশু চৌধুরী-অঙ্কিত প্রাচীর-চিত্র হইতে

রদেনষ্টাইনের অধীনে দেড় বৎসর ইউরোপীয় 'প্রাচীর-চিত্রাঙ্কন' পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে 'ইণ্ডিয়া হাউসে'র দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন ক'রে তাঁরা সকলেই প্রচুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। দেশে ফিরে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের শিল্পোন্নতির কাজে লাগাচ্ছেন। এই সব ইউরোপ-প্রত্যাগত শিল্পীদের মধ্যে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ ও সুধাংশু চৌধুরীই বাংলাদেশে 'প্রাচীর-চিত্রাঙ্কনে'র কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। বর্ত্তমানে জনসাধারণের মধ্যেও 'প্রাচীর-চিত্রের' প্রতি একটা আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের পাঠাগারের তিন-দিকের দেয়ালেই 'প্রাচীর-চিত্রাঙ্কন' করিয়েছেন। শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ এই সুবৃহৎ কাজ অতি যোগ্যতার সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন। প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের সমগ্র ইতিহাস এই চিত্রের বিষয়-বস্তু ছিল। বর্ণ-বিন্যাস, সাবলীল রেখা-ভঙ্গিমা, বিষয়-বস্তুর বিজ্ঞানসম্মত স্থাপনার দ্বারা ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দেওয়ালে যে অপূর্ব্ব চিত্রাঙ্কন করেছেন তা চিরকাল বাংলার গৌরব-স্বরূপ হ'য়ে থাকবে।

কলিকাতার সিনেমা-গৃহগুলি বর্ত্তমানে তাদের রূপ-শয্যার অঙ্গ হিসাবে 'প্রাচীর-চিত্রের' আদর করছে। শিল্পী সুধাংশু চৌধুরী মহাশয় মেট্রো, চিত্রা, প্রভৃতি সিনেমা-গৃহের 'প্রাচীর-চিত্রাঙ্কন ক'রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে তাঁর অঙ্কিত কয়েকখানি প্রাচীর চিত্রের নমুনা ছাপা হল। পাঠকেরা এই ছবিগুলি থেকে বর্ত্তমান বাংলার প্রাচীর চিত্রের একটা ধারণা ক'রে নিতে পারবেন।

বাণী মা

১৫ পৃষ্ঠার শেষ

—কোথায়? কোথায়?

—সেই চান-ঘরের পাশে চোরকুঠুরীতে আমার খেলা ঘরে! কুলুপ দিয়ে—। তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে তুলিয়া বলিলাম—কই, বের ক'রে দেবে চল তো মা!

সে বলিল—সেই মা যখন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল তখুনই আমি দেখলাম। দেখে—বলি সামলিয়ে রেখে দিই!

খেলাঘরেই বাক্সটি দেখিলাম। তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইতে গেলাম—কিন্তু বাণী বাধা দিয়া বলিল, দাঁড়াও কুলুপ খুলি!

বলিয়া সে শূন্যে চাবী ঘুরাইয়া—মুখে শব্দ করিল—কুট্‌স—কু লুপ—!

আজ ১০ বৎসর—
সেনোলার
রেডিও সেট
রেডিও গ্রামো
এমপ্লিফায়ার
সহর ও পল্লীতে

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। সমস্তই বিলাতী সরঞ্জাম—সুর ও সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, দাম খুবই কম।
আজই অনুসন্ধান করুন!
সেনোলা রেডিও সেট ৩টী ভাল্‌ব ডি, সি. মেন - ৯০৲ টাকা হইতে
সেনোলা রেডিও সেট ৩টা ভাল্‌ব ব্যাটারী সেট—১৩০৲ হইতে ব্যাটারী সমেত।
সোল ডিষ্ট্রিবিউটরস্ :—আমেরিকার জি, ই, সেটের
এন, বি, সেন & ব্রাদার্স
১১নং এসপ্ল্যানেড, ২১নং চৌরঙ্গী
(লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়ে)

বিজ্ঞপ্তি

৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষে 'সচিত্র ভারত' দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। ২০শে অক্টোবর অফিস খুলিবে এবং ২৩শে অক্টোবর হইতে নিয়মিতভাবে "সচিত্র ভারত" প্রকাশিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
সচিত্র ভারত

কমলেশকুমারী

নীতিন বসুর পরবর্ত্তী হিন্দী ছবির নায়িকা

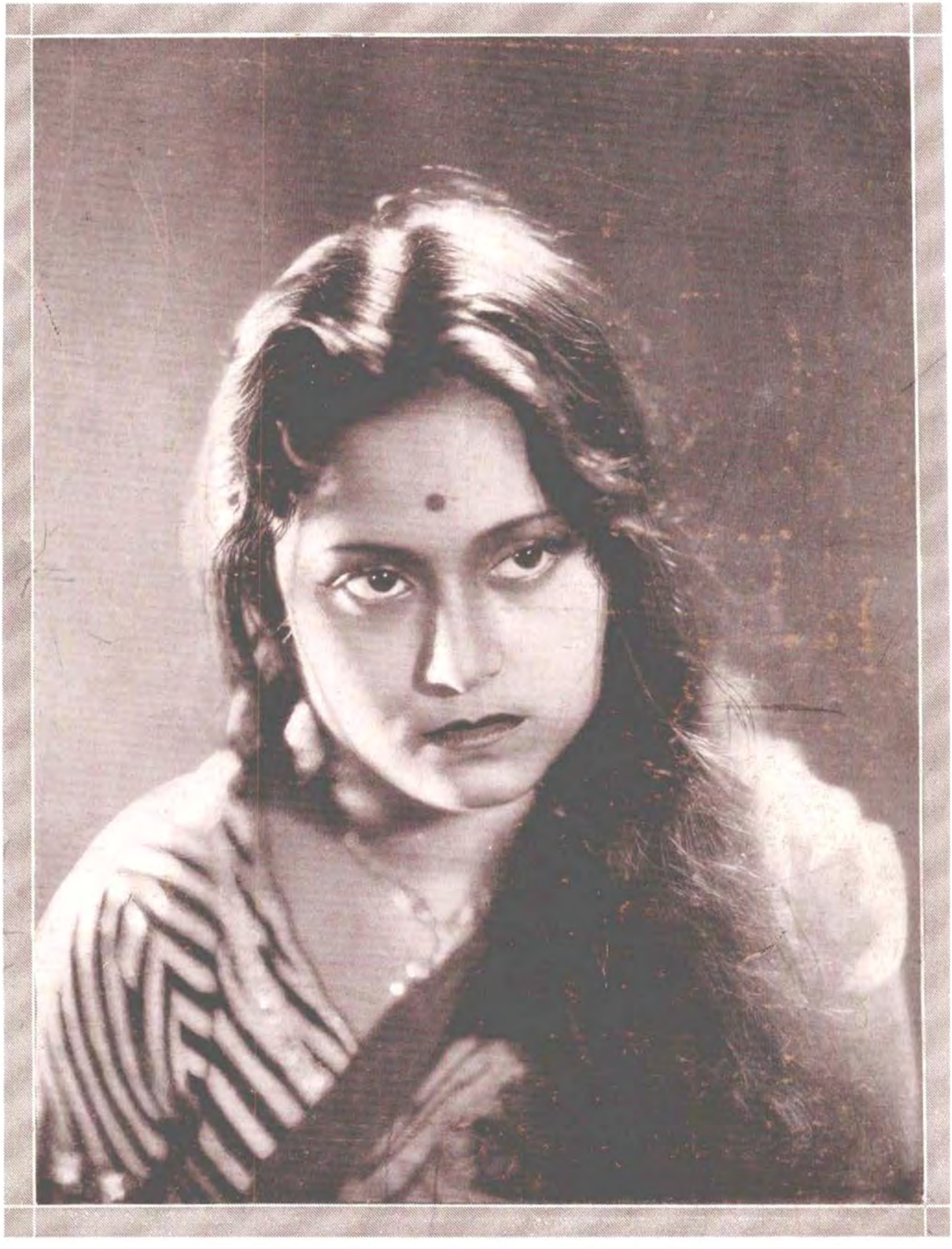

মিস্ মলিনা
নিউ থিয়েটার্সের পরবর্ত্তী চিত্র "অভিজ্ঞান" (বাংলা ও হিন্দী) এর নায়িকার ভূমিকায় ইঁহাকে দেখা যাইবে।

গহনা নয় যেন রূপসজ্জার আলেখ্য

কি অনুপম ৩৮৭নং কানবালাটী

চিতালিয়ার রূপার উপর মিনা করা পাথর সেটিংএর এবং কটকী তারের গহনা আভিজাত মহলের রূপ সাধনার অঙ্গ বলিয়াই এত সমাদর।

কত নূতন নূতন ডিজাইন আর কি কারু শিল্প! একবার এসে দেখুন বা পত্র লিখুন। ।০ দিলেই সচিত্র নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

চিতালিয়া ব্রাদার্স ঃঃ কলিকাতা

১৬৬নং হ্যারিসন রোড (বড়বাজার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দক্ষিণের ফুটে দোতলায়) ফোন বি, বি, ২৫৭৫

৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, (কাত্যায়নী ষ্টোর্সের পূর্ব্বদিকে)। B. R

পূজার

পোষাক ও শাড়ীর নূতনত্ব।

ছেলেদের নূতন ডিজাইনের সুট—মেয়েদের রকমারি হাল-ফ্যাসানের ফ্রক—আধুনিক রুচিসঙ্গত ব্লাউজ—নানাবিধ কাপড়ের বহু-পরিমাণে ৺পূজার জন্য আমদানী করিয়াছি—

দামেও সুবিধা।

কমলালয় লিঃ

পোষাক ও বস্ত্রবিক্রেতা

ফোন্—বি, বি, ৬৪২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

আপনার পূজার ছুটি দার্জ্জিলিংএ অতিবাহিত করুন

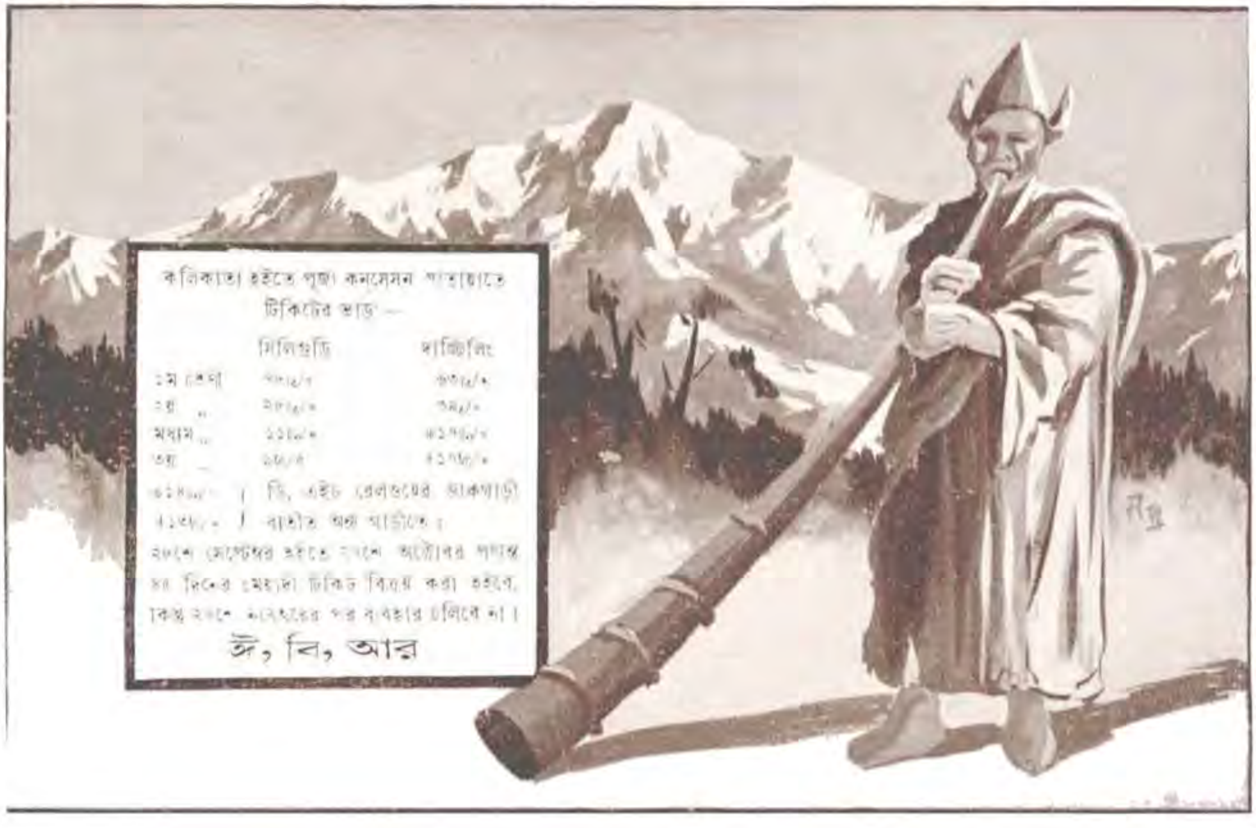

বাংলা গদ্যের জনক

প্র, না, বি,

সরস্বতীর এজলাসে বড় ভারি মামলা এমনতর মামলা স্বর্গে কেন, মর্ত্ত্যেও দেখা যায় না। একটি ছোট শিশু, বয়স দেড়শ বছরও হয় নাই, হামাগুড়ি দিয়া চলে, মা-কে মামা বলে, বাবাকে বা বলে, দাদাকে বলে তা, তাকে লইয়াই মামলা। পৃথিবীর খবর যতটা জানি, বিপদকালে একটি বাপই খুঁজিয়া মেলে না, এই শিশুটির কিন্তু সাত সাতটি বাপ জুটিয়া গিয়াছে। এক সঙ্গে অবশ্য সাতজন বাপ হইতে পারে না (একেবারে কি অসম্ভব?), এই পিতৃ-বাহুল্য হইতে শিশুকে বাঁচাইয়া আসল বাপের হাতে দিতে হইবে।

সরস্বতীরও মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। বেচারা সেকালের মেয়ে। কিন্তু তাঁর আন্তরিকতার ত্রুটি নাই। তিনি এ'কে এ'কে বাদীদের আহ্বান করিলেন। শিশুটি হাতে সোনার বালা পরিয়া বসিয়া বসিয়া চুষিকাটি চুষিতে লাগিল।

প্রথম বাদী উপস্থিত হইলে সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নাম কি?

—উইলিয়াম কেরি।

—তুমি ইংরাজ, বাঙ্গালীর বাপ হইলে কেমন করিয়া?

—লেডির সম্মুখে বলিতে লজ্জা করে।

—আচ্ছা যাও!

দ্বিতীয় বাদীকে প্রশ্ন করিলেন—

—তোমার নাম কি?

—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

—তুমি বামুন পণ্ডিত হইয়া এ কাজ করিলে কেমন করিয়া?

—আজ্ঞে বামুন হইলেও, আমি মানুষ।

তৃতীয় বাদীকে প্রশ্ন হইল—তোমার নাম?

—দীনের নাম রামরাম বসু।

—তুমি ইহার বাপ কোন্ প্রমাণে?

—আজ্ঞে এ সব ব্যাপারে আসল প্রমাণ বড়ই গোপনীয়।

চতুর্থ আসামীর ডাক পড়িল।—নাম?

—রামমোহন শর্ম্মা।

—তুমি শুনিয়াছি ব্রাহ্ম--হিন্দুর বাপ হইলে কি প্রকারে?

—আজ্ঞে মুসলমানের বাপ হইলে হিন্দুর কেন হইব না।

গোল ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সরস্বতী পঞ্চম বাদীকে ডাকিলেন।

—তোমার নাম?

—আজ্ঞে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বিদ্যাসাগর।

—এ তোমার ছেলে?

বিদ্যাসাগর প্রশ্ন শুনিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সরস্বতী ষষ্ঠ বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

—নামটি কি বাপু?

—প্যারীচাঁদ মিত্র—প্রকাশ্য নাম টেকচাঁদ ঠাকুর।

—তোমার কি বক্তব্য?

—আজ্ঞে সন্তান ফিরাইয়া দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়।

শেষ বাদীর ডাক পড়িল—নাম? —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

—এই কি তোমার একমাত্র সন্তান? —না আরও আছে? গোবিন্দলাল, প্রতাপ, নগেন্দ্রনাথ...

সরস্বতী কিছুই ঠাহর করিতে পারিলেন না। বাদীরা কেহই দাবী ছাড়ে না, প্রত্যেকেই নিজের অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য বড় বড় পণ্ডিতদের নাম বলিতে লাগিল; দীনেশচন্দ্র, সুনীতিকুমার, সুকুমার, সুশীলকুমার, ব্রজেন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত—সে এক তুমুল কাণ্ড। পিতৃকুলের আর্ত্তনাদে শিশু ভয় পাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পূজাবকাশে
বিদেশে আমোদ প্রমোদ এবং
আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক ও
তাহার সকল উপকরণ

আপনাদের চিরপরিচিত বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী
বন্দুক বিক্রেতা
ধর্ম্মতলায় "দাঁ বিল্ডিং"এ
আশুতোষ দাঁ কোম্পানীতে
ক্রয় করিয়া সন্তোষ লাভ করুন

তখন সরস্বতী এক বুদ্ধি স্থির করিলেন। জল্লাদকে আদেশ দিলেন—এই শিশুকে কাটিয়া সাত টুক্‌রা করিয়া সাত বাপকে দাও। কিন্তু একি আশ্চর্য্য, বাপগণ তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইল না। বরঞ্চ বঙ্কিমচন্দ্র নামে লোকটা বলিল—জজবিবি, আমাকে হাত দু টুক্‌রা দিতে আজ্ঞা হয়।

—কেন ?

—আজ্ঞে এক জোড়া সোনার বালা আছে।

টেকচাদ ঠাকুরের হাসি দেখিয়া সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, —হাসো কেন ?

—আজ্ঞে এর মাথা কাটা গেলে, এর যে মাথা নাই সেই অপবাদ দূর হইবে।

জল্লাদ কাটিতে উদ্যত এমন সময়ে লুঙ্গিপরা, মলিন, শীর্ণ, দাড়ি-রোমাঞ্চিত একটা লোক ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—

থামো কর্ত্তা থামো !

—কেন ? তুমিও কি ইহার বাপ নাকি ?—আমিই এই লেড়কার বাপ।

—প্রমাণ ?

—প্রমাণ আবার কি ? আমি এরে খাওয়াই, পরাই, পোবাক দিয়া আঁটিয়া দিই, বাঁধাই—আমাকে নহিলে এর চলে কই ? এই কর্ত্তারাই বলুক, আমার হাতের খবরদারি না হইলে বাজারে ছোক্‌রা বিলকুল অচল।

সরস্বতী সপ্ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার কথা সত্য ?

সাতজন অধোবদনে রহিল।

সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নাম ?—আজ্ঞে, মুই মকবুল দপ্তরী।

সরস্বতী বলিলেন—তুমিই ইহার **Bonafide** বাপ। এবং রায়ে লিখিলেন—বাংলা গদ্যের পিতা মকবুল দপ্তরী ; যেহেতু বাংলা সাহিত্য দপ্তরীর আর্ট হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য বাদীদের দাবী ডিসমিস্। পক্ষগণ নিজের নিজের খরচ বহন করিবে।—(স্বাঃ) সরস্বতী দেবী

সিল্ক

বিচিত্র ধরণের শাড়ী, রকমারি ডিজাইন, বাজার দর অপেক্ষা আশ্চর্য্য রকম সস্তায় বিক্রয় হয়।

একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মতিলাল রামজীদাস

১৯৭ নং হ্যারিসন রোড, বড়বাজার

ফোন—বি, বি, ২০১ কলিকাতা

বাসন্তী

ধুতি—শাড়ী—আদ্দি লংক্লথ ইত্যাদি—

সকলের সেরা

পূজার বাজারে সব জায়গায় পাবেন।

বাসন্তী-কটন মিলস্ লিঃ

৩নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

ফোন্ নং কলিকাতা ৩২১৬

মিল— পাণিহাটী

সন্তরণ

শ্রীশান্তি পাল

আজকাল স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে বিপুল উদ্যম দেখিতে পাই। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছে, তবে স্বাস্থ্য-চর্চ্চা হিসাবে সন্তরণে বাংলাদেশ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীরগঠন বিষয়ে সন্তরণের প্রয়োজনীয়তা যে কিরূপ তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সন্তরণে শরীরের সকল অংশ সুন্দররূপে সঞ্চালিত হইয়া পেশীগুলি পুষ্ট ও দৃঢ় হয় এবং শ্বাসযন্ত্রও সবল হয়। স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রফুল্লতাও বৃদ্ধি পায়। সন্তরণকে আমরা শরীর-চর্চ্চার প্রথম সোপান বলিতে পারি। ইহাতে খেলার আনন্দও যেরূপ পাওয়া যায়, অঙ্গসমূহ সবল এবং সুগঠিতও হয় সেইরূপ। ইহা সহজসাধ্য এবং ব্যয়ও ইহাতে অল্প। সন্তরণ ভাল জানা থাকিলে বিপদকালে জলে আত্মরক্ষা করা তো যায়ই, নিমজ্জমান ব্যক্তিকে জল হইতে উদ্ধার করাও সম্ভব হয়। নদীবহুল বাংলাদেশ, এখানে সন্তরণ না জানা থাকিলে বিপদ যে কতখানি তাহা সকলেই জানেন। আমাদের দেশে বালক-বালিকাদিগের মধ্যে স্বাস্থ্যের জন্য তো বটেই, আত্মরক্ষা এবং নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে পারার জন্যও সন্তরণ-শিক্ষা ব্যাপকভাবে দেওয়া উচিত। বিদ্যালয়সমূহ তো সন্তরণ-শিক্ষা কম্পাল্সারি বা বাধ্যতামূলক অনায়াসে করিতে পারেন। তাহা ছাড়া সন্তরণের সুবিধা ও শিক্ষার জন্য পাব্লিক স্কুল ও পাব্লিক বাথের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশে উদ্যোক্তা ও অর্থের অভাব আছে। সাধারণের নিকট হইতে উৎসাহও তেমন পাওয়া যায় না। সন্তরণ-সমিতি কয়েকটি আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা দলাদলিতেই ব্যস্ত, কাজ করিবেন কখন? তাঁহাদের লক্ষ্য কেবল, কিরূপে আপন প্রাধান্য রক্ষা করিবেন, কিরূপে আগামী বৎসরের ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করিবেন। কাজের কথা ইঁহাদের ভাবিবার অবসর নাই, এখন এখানে চার-পাঁচটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইঁহাদের কেহ বেঙ্গল অলিম্পিকের পক্ষপাতী, কেহ চান নূতন করিয়া অল্-বেঙ্গল-সুইমিং ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা করিতে, কেহ চান পুরাতন সুইমিং এসোসিয়েশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় এবং কাহারও ইচ্ছা, ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এইরূপ দলাদলির মধ্যে পড়িয়া উদীয়মান সাঁতারুগণের অনেকেই সন্তরণ-চর্চ্চা ছাড়িয়াছেন, এবং এই কারণেই আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিকে এ বৎসর কোন সাঁতারু

বা ওয়াটার পোলো টীম পাঠানো হয় নাই। এইজন্য অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, এদেশের সন্তরণকারীরা আমেরিকা বা জাপানের সন্তরণকারীদিগের অপেক্ষা হীন। কিন্তু এদেশের দূর-পাল্লা প্রতিযোগিতার (১৫০০ মিটারস্) সময়-সীমা অপরাপর দেশের সময়-সীমার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, এদেশের সাঁতারুরা অপর দেশের সাঁতারুদের তুলনায় হীন নহেন, একটু যত্ন বা চেষ্টা করিলে ইহারা তাঁহাদের সমকক্ষ অল্প দিনের মধ্যে হইতে তো পারেনই, কোন কোন ক্ষেত্রে (বিশেষতঃ ওয়াটার পোলোয়) শ্রেষ্ঠত্বলাভও অসম্ভব না হইতে পারে। মনে পড়ে, গত আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিকে শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র মালিক এদেশে ১৫০০ মিটারস্‌এ ২৫ মিঃ টাইম করিয়া ওদেশে ২ মিঃ টাইম কমাইয়া ছিলেন অর্থাৎ ২৩ মিঃ করিয়াছিলেন। গত বৎসরে শ্রীমান্ মদনমোহন সিংহকে ভারতের প্রতিনিধিরূপে পাঠান উচিত ছিল। কারণ তাঁহার টাইম ছিল ২০ মিঃ ৪৯ সেঃ। সাঁতারুর ফর্ম্ম বেশীদিন থাকে না। ওয়াটার পোলো সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা যাইতে পারে। এদিকে সমিতিগুলির কর্ত্তৃপক্ষের আদৌ মনোযোগ নাই। খ্যাতনামা সাঁতারুগণকে তাঁহারা কেবল অর্থের প্রলোভনে আপন সমিতিভুক্ত করিতে পারিলেই ধন্য হন। তাই আজ যাঁহাকে বেঙ্গল অলিম্পিকের অধীনে সাঁতার দিতে দেখিতেছি, কাল তাঁহাকে অন্যত্র দেখিতে পাই। কর্ত্তৃপক্ষের শৈথিল্য এবং সাঁতারুগণের প্রলোভন-পরাজয়ই ইহার কারণ। ফলে সমিতিগুলি ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, পুরাতনের ফর্ম্ম পড়িয়া যাইতেছে, নূতন সাঁতারুও গড়িয়া উঠিতেছে না। ইহার প্রতিকার আবশ্যক অবিলম্বে। আমাদের কর্ত্তব্য সকল মতভেদ ও দলাদলি ত্যাগ করিয়া আগামী আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিকের জন্য এখন হইতেই প্রস্তুত হওয়া।

একটি চিঠি

মধুচাক, চন্দননগর

'সচিত্র ভারত' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

মহাশয়,

আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। চিনি বলিলে ভুল হয়, আপনার নাম জানি। অবশ্য 'সচিত্র ভারতে'র সম্মুখে আপনাকে কখনও দেখি নাই, দেখিবার আশাও করি না। তবে তাহার পিছনে আপনাকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছিল যে, আপনার মত অমায়িক বিনয়ী সম্পাদক দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি সেজন্য বহুবার মনে মনে আপনার উদ্দেশ্যে সসম্ভ্রমে শির নোয়াইয়াছি।

সম্প্রতি একটা কথা শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। শুনিলাম, আপনি রেস খেলেন। প্রথমটা বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু যে সূত্রে খবরটি পাইয়াছি তাহাতে অবিশ্বাসের কোনই কারণ নাই। যাহা হউক, যখন রেস খেলেন তখন আমি বলিলেও খেলিবেন, না বলিলেও খেলিবেন।

আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন না দুঃখিত হইবেন, জানি না—আমিও রেস খেলি। আমি গত ১৫ বৎসর ধরিয়া খেলিয়া আসিতেছি এবং হয়তো মৃত্যু পর্য্যন্ত খেলিব। তবে আপনার খেলায় ও আমার খেলায় একটু প্রভেদ আছে। আপনি খেলেন, কখনও হারেন, কখনও জেতেন, কিন্তু আমি যে ঘোড়াই ধরি না কেন, হারিবই। আমি গত ১৫ বৎসর ধরিয়া হারিয়া আসিতেছি, এখনও হারিতেছি এবং ভবিষ্যতেও হারিব জানি।

যাহা হউক, আসল কথা এইবার বলি। আপনি রেস খেলেন নিশ্চয়ই জিতিবার জন্য। আমি নিজে হারিলেও আপনাকে জিতাইয়া দিতে পারি। হয়তো মনে করিতেছেন, আমি পাগল বা জোচ্চোর, কিন্তু আমি দুইটির একটিও না। আমার জিতাইবার পদ্ধতি অতি সহজ। পত্র পাওয়ামাত্র আমাকে উপরিলিখিত ঠিকানায় ৫০০৲ শত টাকা পাঠাইয়া দিবেন ও তৎসঙ্গে আপনি কোন্ ঘোড়া ধরিবেন তাহা লিখিয়া দিবেন। আমি ঐ ৫০০৲ হইতে ১০০৲ টাকা নিজে রাখিয়া ৪০০৲ টাকা আপনি যে ঘোড়া ধরিয়াছেন সেইটি বাদে অন্য সবগুলিতে কিছু কিছু করিয়া ধরিয়া দিব। তাহা হইলে আপনার ঘোড়া নিশ্চিত আসিবে, কারণ আমি যে ঘোড়াই ধরি না কেন, হারিবই হারিব, এইরূপে আপনি আমার সাহায্যে বহু অর্থের মালিক হইতে পারিবেন।

আশা করি, টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না।

হারাণ রায়

পুঃ যদি এপ্রস্তাবে আপনার কোনওরূপ অসুবিধা হয় তাহা হইলে আপনার গ্রাহকদিগের ভিতর কেহ রাজি থাকিলেও চলিতে পারে।

বোনাস আজীবন বীমায় ২০৲
বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান—
ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ
স্থাপিত—১৯০৮
১০২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
বোনাস মেয়াদী বীমায় ১৬৲

বার্লি — বিশুদ্ধতায় শ্রেষ্ঠস্থানীয় আদর্শ পথ্য ও পানীয়

বিস্কুট — রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অপরাজেয় সবাই জানে

বোম্বাই ❀ লিলি বিস্কুট কোং ❀ কলিকাতা

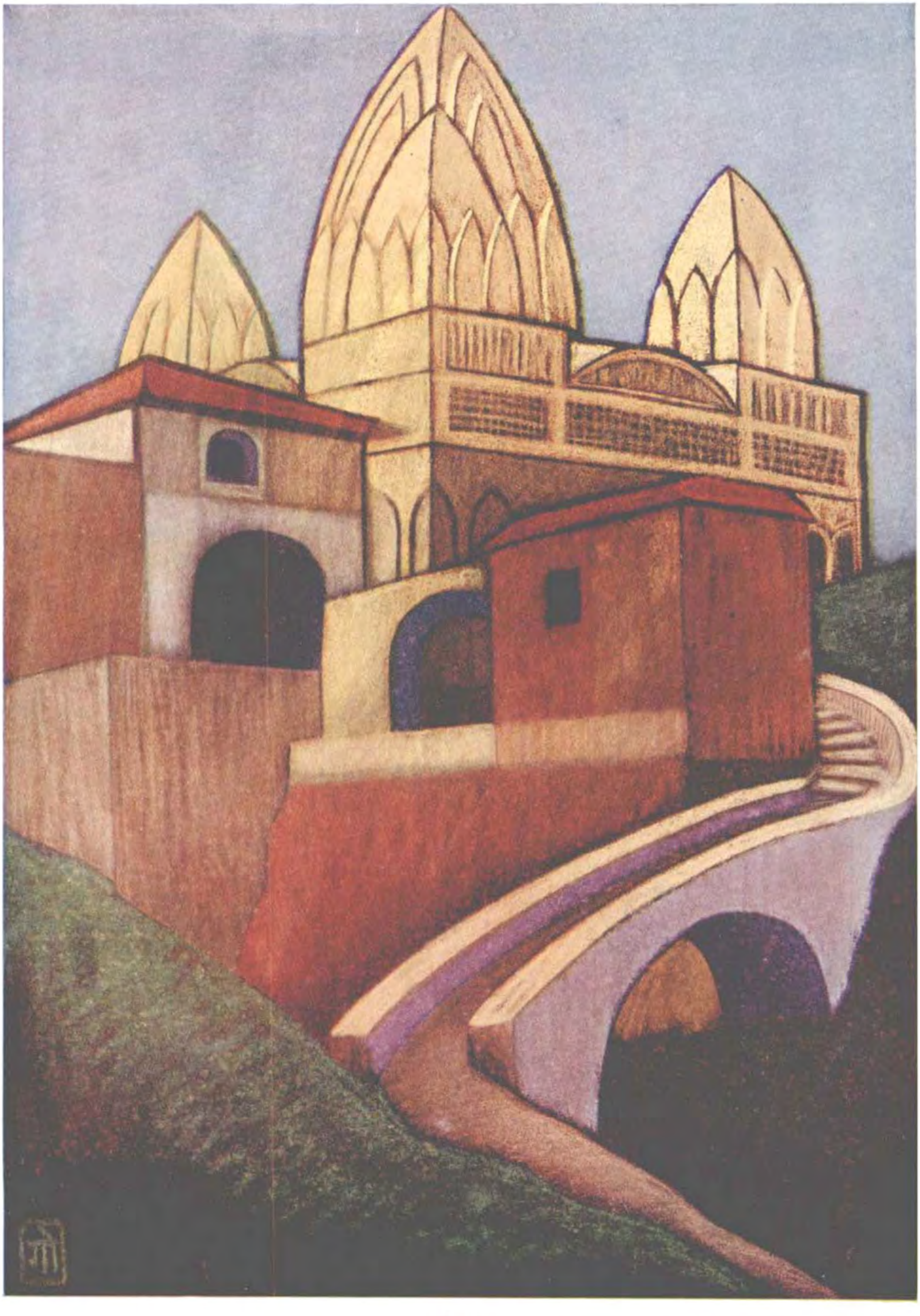

মন্দির

বাতায়ন-পথে

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

আমার জানলার পাশে পাশের বাড়ীর অন্দর, একটু আড়ালে আমার লেখা-পড়ার টেবিল, সেখানে ব'সে প্রতিটি কথা শোনা যায়। শুনি-ও।

সেদিন শুন্‌লুম্‌, ওদের বৌ থিয়েটার থেকে ফিরল, কে জানে কার সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে নয়, কারণ সে ওপরে ঘুমোচ্ছে জানি, বুড়ো-শাশুড়ী মর্‌তে মর্‌তে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। বৌ চপ্পল

আমার জন্য ত ওঁর ভাবনা কত !

ঘস্‌টাতে ঘস্‌টাতে ওপরে আস্‌ছে, বুড়ী বল্‌লে, 'কোলের মেয়েটা কি থাকে! কেঁদে কেঁদে সারা! কত ক'রে তাকে থামাই, এই ঘুমিয়েছে। আমার চোখে ঘুম নেই, কখন তুমি আসো ব'লে জেগে ব'সে আছি ঠায়।'

বৌ ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, 'আপনার জেগে থাকবার কি দরকার ছিল? ভজুয়া ত' সদরে শুয়ে আছে।'

'তার কি সহজে ঘুম ভাঙে? দেখ্‌ছ ত?'

'না ভাঙে, সে আমরা বুঝ্‌তুম!'

'আমারও ত ভাবনা হয়! বুক ধড়ফড় ক'রে মরি!'

'আঃ! আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি না। আমার জন্য ত ওঁর ভাবনা কত! আর বলবেন না!'

সে রাত্রে বুড়ী ঘুমোতে পারেনি, বুঝ্‌তে পারলুম, কারণ আমার দেয়ালের লাগাও তার ঘর। সমস্ত রাত উঃ আঃ আর দুর্গা দুর্গা ক'রেছে।

ভোরবেলা উঠে বুড়ী ছেলেকে ডেকে বল্‌লে, 'বিষ্টু, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, চৌপরদিন বৌয়ের নাতি-ঝাঁটা খেয়ে আর থাক্‌তে পারিনা। কত পাপ করেছিলুম্‌, তাই এই কষ্টভোগ আমার'—ব'লেই হাউ হাউ ক'রে কান্না।

ছেলে বল্‌লে 'সকালবেলা মড়াকান্না জুড়লে, সংসারের মঙ্গল-অমঙ্গলের দিকে দৃষ্টি নেই? চলো কাশীতে। কালই দিয়ে আসি। তোমাকে চিতায় না তুল্লে আমার আর শান্তি নেই। ছোটলোকের মতন কাণ্ড তোমার! আপদ্‌ কোথাকার!'

বুড়ী কান্না গিলে ফেল্‌লে। তক্ষুনি হাসিমুখে নাতিকে বল্‌লে 'মিছ্‌রি চাই তোর? মুখ ধুয়েছিস্‌? যা ধুয়ে আয়, তারপর।' পরদিনেই বুড়ীর পুঁটুলী পোঁট্‌লা বাঁধা হ'ল, বুড়ী সকাল থেকে কাঁদ্‌ছে, বলে 'যাবনা এই সংসারই আমার গয়া-কাশী। একটা ছেলে ছেড়ে আমি সেখানে থাক্‌তে পারব না। কেন মিছে চেষ্টা কর্‌ছিস্‌?'

কে শোনে কার কথা! ছেলে-বৌ জিদ্‌ ধরেছে, যেতেই হবে। এতদিন 'কাশী দিয়ে এসো, কাশী দিয়ে এসো' ক'রে এখন বেঁকে বস্‌লে চল্‌বে কেন?

চ'লে গেল বুড়ী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে। যাবার সময় ব'লে গেল,

কৃষ্ণ-কুন্তল

আনয়ন করে ঃ—
১। ঘন-কুঞ্চিত
কৃষ্ণ-কুন্তল
২। সদা-প্রফুল্লতা

নিবারণ করে ঃ—
১। অকালপক্কতা
২। কেশপতন
৩। কেশহীনতা
৪। শিরঃপীড়া
৫। অবসাদ

A-ONE PRODUCTS MFG. CO.
P. O. Dhakuria, CALCUTTA

'আমি গিয়েই ম'রে যাব, তোর হাতের জলটাও শেষ সময় পাব না? তোর কি একটুও দুঃখ হচ্ছে না?'

ছেলে বল্‌লে, 'না হচ্ছে না। তুমি মা নও—রাক্ষুসী।'

বুড়ী চ'লে যেতে পাড়ার লোক ছি ছি ক'রে উঠ্‌ল, তোমরাও করছ, বলছ, এ ছেলেকে আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মারেনি কেন? কিন্তু এসো আমার জানলার ধারে কুড়ি বছর আগে।

বৌটি সেদিন নতুন ক'নে। শাশুড়ী তাকে ভাল চক্ষে দেখেনি, কারণ বেশী কিছু সে সঙ্গে আনতে পারেনি। শাশুড়ী সেদিন যাকে পেয়েছে তাকে ডেকে বলেছে, আমার একটা ছেলে, কোন সাধ মিট্‌লনা এ হ'তে। নগদ তেমন কিছু পেলুম না। তত্ত্ব তাবাদেরও ছিরি দেখো না! বেয়াই বুঝি কাঁচা চামড়ার ব্যবসা করে?

বিয়ের পনেরো দিন পরে। বউ সমস্ত মসলা বেটে নিয়ে রান্না করছে, গিন্নী ফিরল গঙ্গা নেয়ে। ঘাটের সঙ্গীদের কাছে তাদের বৌএর সুখ্যাতি শুনে মেজাজ হ'য়ে আছে গরম। বল্‌লে 'নুন গুঁড়িয়ে নাও।'

আস্তে বৌ বল্‌লে, 'নুন গুঁড়োন আছে, তাতেই আজ চ'লে যাবে।'

—'তবুও গুঁড়োও।' শাশুড়ী বল্‌লে।

'এই বাটনা বেটে উঠ্‌লুম, হাত কন্‌কন্ করছে, কাল করব মা।'

'কী, চোপা! ছোটলোক ইতরের বেটি, থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দোব, জানো না? আমি বল্‌ছি, আমার মুখের ওপর চোট্‌পাট্ জবাব?'

কুস্তীর আখ্‌ড়া থেকে মাটি মেখে ছেলে ঢুকল, কি হয়েছে মা?'

'বৌ আমার মুখের ওপর চোপা করছে সমানে-সমান!'

মাতৃভক্ত পুত্র বল্‌লে 'বিয়ে ত আমি করতে চাইনি মা! তুমিই ধ'রে বেঁধে এই বীরভদ্র ঘটালে। বেশ ছিলুম মায়ে-পোয়ে, কোথা থেকে ঘর ভাঙাতে এলো!'

উৎসাহের আতিশয্যে মা ব'লে চল্‌ল—'ভদ্র বংশ হ'লে কি এমন হ'ত!'

'ও কথা বল্‌বেন না মা!' ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বধূ।

ছেলে শুন্‌তে পেয়ে বলে, 'চোপ্‌রাও! চাব্‌কে লাল ক'রে দোব। আমাকে তুমি চেনো না? মা যা বল্‌বে, মুখ বুজে শুনে যাবে। মায়ের জন্যে দাসী এনেছি তোমায়, তোমার জন্যে মা নয়। মনে রেখো।'

একটা রবিবার। সেদিন বিকেল বেলা ঘর থেকে বৌ বেরিয়ে এসে চা করতে যাচ্ছে, শাশুড়ী বল্‌লে, 'দুপুরে ঘরে ঢুকিস্, তোর কি লাজলজ্জা কিছু নেই!'

বৌ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। বল্‌লে 'ঘুমোব কোথায়?'

'এই বারান্দায়!'

'এখানে লোকজন যাওয়া-আসা করছে।'

বৌ হেঁট হ'য়ে চায়ের কাপগুলো নিতে যাচ্ছিল, শাশুড়ী পিছন থেকে এসে বল্‌লে, 'দাঁড়িয়ে লাথি মারব তোকে!' লাথিই

অত তেজ রাখবি কোথায়?

মারলে। বৌ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে ভাঙা-পেয়ালায় হাত কাট্‌লে, এবং ব্যাপারটা যেন গিলে ফেললে। ছেলে যখন বেরিয়ে যায়, মার তখন বাক্যবাণ বর্ষণ হয়, ছেলের কাণে

বনকুসুম কেশতৈল

স্নিগ্ধকারক ও কেশবর্দ্ধক

অধ্যাপক জে, কে, চৌধুরী, এম, এস্-সি, পি, এইচ, ডি, বলেন—

"আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আমি নিজে **বনকুসুম** কেশতৈল ব্যবহার করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি"

কোনো কথাই বৌ তোলে না। একদিন খস্তি ছ্যাকা অবধি হ'য়ে গেল, তবু বৌ মুখ খুল্‌লে না।

একদিন মা বল্‌লে, 'বিনু আগে আমার হাতে মাইনের টাকা এনে দিত, আজকাল তোর পরামর্শে আর দেয় না, তুই আমার ছেলেকে লাগিয়ে ভাঙিয়ে নষ্ট করেছিস্।'

'আপনার ছেলে আমার কথা শোন্‌বার লোক নয়।'—এই সময়ে সিঁড়ির কাছে বিনু এসে পড়েছে।

মা দেখ্‌তে না পেয়ে বলে চল্‌ল, 'বিনু ব্যাঙ্কে টাকা জমাচ্ছে তাই তোর অত বাড় বেড়েছে হতচ্ছাড়ী। ও যেদিন চোখ বুজ্‌বে সেদিন ত এই আমারি পায়ে তোকে তেল দিতে হবে। অত তেজ রাখ্‌বি কোথায়?'

বিনুর চোখ খুলে গেল এবং তোমাদেরও! কারণ ছেলের সম্বন্ধে এমন কথা কোনো মা কখনো বল্‌তে পারে, কেউ বিশ্বাস করবে না. কিন্তু এ আমার কানে-শোনা, চোখে-দেখা।

বিনু গম্ভীর হ'য়ে ওপরে উঠে গেল। মা তাড়াতাড়ি ফলের থালা নিয়ে ওপরে গিয়ে বল্‌লে, 'আজ সকাল সকাল ফিরলি কেন বাবা? অসুখ করেছে?'

বিনু জবাব দিলে না। ফলের থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বত্রিশ বছরের মাতৃভক্তি তার চূর্ণ হ'য়ে গেল একটি কথায়।

খানিকক্ষণ পরেই স্ত্রীর চোখের জল আর পিঠের বীভৎস ক্ষত চিহ্ন মায়ের নাম অবধি তার মন থকে মুছে দিলে।

যেখানে চরম নির্ভরতার পাত্রী ব'লে মা দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এলো গৃহিণী। সংসারের চাবি ঝনাৎ ক'রে শব্দ করে ও আঁচল থেকে এ আঁচলে চ'লে এলো।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে এক নির্য্যাতিতা বধূ জেগে উঠ্‌ল প্রতিশোধপিপাসায়। বধূ হ'ল কর্ত্রী, মাতা হ'ল দাসী।

তোমরা কি বল্‌বে, 'ঠিক হয়েছে?' 'ঠিক্' কথাটার ওপর জোর দিয়ে? বধূরা কি আমার মুখে দেবে ফুলচন্দন আর শাশুড়ীরা উনুনের ছাই? তবে, আমি আমার জান্‌লা বন্ধ ক'রে স'রে পড়ি!

"টেলিফোন ত স্যার কোন সময়েই use করতে পারছিনা—আরো দুটোর দরকার—"
"কেন, আরো দুটো দিয়ে কি হবে?"
"একটা স্যার Share market এর জন্যে, আর একটা Race এর জন্যে।

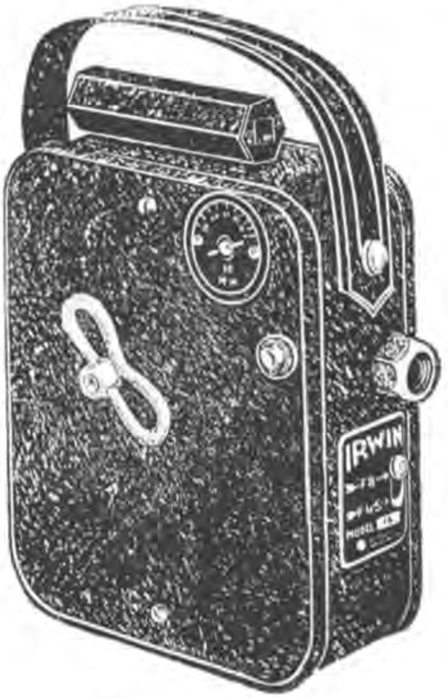

আপনার প্রিয়জনের বা কোন বিশেষ ঘটনার চলন্ত ছবি আপনি নিজে তুলিবেন ও সেই ছবি বহুবৎসর পরেও পর্দ্দার উপর ঠিক জীবন্তভাবে দেখিবেন এবং সকলকে দেখাইবেন!

ছবি তুলিবার জন্য আপনার চাই একটী

আর্‌উইন্ ম্যুভি

ক্যামেরা

আর সেই ছবি পর্দ্দাতে প্রতিফলিত করিবার জন্য একটী

আর্‌উইন্

প্রোজেক্টার

৫০৲ মাত্র

আর্‌উইন্ ক্যামেরাতে—

ছবি তোলা অতি সহজ ব্যাপার। একটী Snap-shot Cameraতে ফটো তোলা অপেক্ষাও সোজা। ইহাতে ৪০ ফুট পর্য্যন্ত 16 M.M. ফিল্ম তুলিতে পারিবেন। দাম মাত্র ৫০৲ টাকা।

আর্‌উইন্ প্রোজেক্টার—

ইহাতে ৪০০ ফিট পর্য্যন্ত 16 M.M. ফিল্ম ধরিতে পারে। পর্দ্দাতে বেশ উজ্জ্বল ও স্পষ্ট ছবি প্রতিফলিত হয়। A.C. ও D.C. উভয় Currentয়েই চলে। দাম ১১০ ভোল্ট ৭০৲ টাকা; ২২০ ভোল্ট ৯০৲ টাকা।

৭০৲ মাত্র

বিশেষ বিবরণের জন্য এই কুপনটী পূর্ণ করিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিন।

রেডিও সাপ্লাই ষ্টোর্স লিঃ

৩নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা

মহাশয়গণ, আমাকে আরউইন-সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ আমার ঠিকানায় বিনা খরচে পাঠাইয়া দিন।

নাম...

ঠিকানা.........

রেডিও সাপ্লাই ষ্টোর্স লিঃ

৩নং ডালহাউসী স্কোয়ার

কলিকাতা

সংযম ও দাদ

শ্রীগণেশ

সংযমের ক্ষেত্র অত্যন্ত প্রশস্ত। সংযম আমরা নানাদিক হইতে নানা বিষয়ে দেখাইতে পারি। বিষয় ভেদে সংযমকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইহার মধ্যে কোনটিকে শ্রেষ্ঠ, কোনটিকে উত্তম, কোনটিকে মন্দ, কোনটিকে নিকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। কিন্তু কোন্ বিষয়ের সংযমকে শ্রেষ্ঠ বলা হইবে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। আমি কিন্তু যেটিকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি—তাহা হইতেছে দাদ না চুলকানোর সংযম।

ধরুন, আপনার দাদ হইয়াছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে আপনি না চুলকাইয়া সংযম দেখাইতে পারেন কি? সম্মুখে একটি ছারপোকা যাইতেছে আপনি তাহাকে না মারিয়া থাকিতে পারেন; একটি মশা বা মাছি আপনাকে বিরক্ত করিতেছে, তাহা আপনি নিরুপদ্রবে সহ্য করিতে পারেন; সম্মুখে একটি কেঁচো রহিয়াছে, তাহার গায়ে আপনি নুন ছড়াইয়া না দিতে পারেন; হাতের কাছে একটি পাখী অথবা একটি মাছ আসিলে আপনি তাহাকে না ধরিতে পারেন; পথে বহু নোট সমেত একটি মানিব্যাগ পড়িয়া থাকিতে দেখিলে আপনি তাহা তুলিয়া না লইতে পারেন; আপনার সম্মুখে বসিয়া আপনার বন্ধুবান্ধব পেঁয়াজের বড়া, মাংস, ইলিশ মাছ অথবা নানাবিধ মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছে দেখিয়াও আপনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন; কেহ আপনাকে বহু টাকা ও সম্পত্তি দিতে চাহিলে তাহা লইতে আপনি অস্বীকারও করিতে পারেন, অপরের বহু টাকা দৈবক্রমে আপনার হাতে আসিয়া পড়িলে, সুবিধা থাকিলেও আপনি তাহা বেমালুম মারিয়া নাও দিতে পারেন; আপনার সম্মুখ দিয়া যখন স্কুল কলেজের মেয়েরা হাল্কা হাসিয়া, খাটো আঁচল এবং পাউডারের গন্ধ উড়াইয়া লঘুভাবে চলিয়া যাইবে, তখন তাহাদের দিকে আপনি মুখ তুলিয়া না চাহিতেও পারেন; কোন সুন্দরী মেয়ে আসিয়া আপনার সহিত সিনেমায় যাইতে চাহিলে আপনি তাহাকে সঙ্গে নাও লইতে পারেন; কোন বিবাহিতা যুবতী আসিয়া গোপনে আপনার নিকট আত্মদান করিতে চাহিলে আপনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেও পারেন; নূতন বিবাহিত হইলে স্ত্রীর সহবাসও আপনি কিছুদিন না করিতে পারেন, কিন্তু দাদ না চুলকাইয়া থাকিতে পারেন কি? পারেন না। শুধু আপনি কেন, আমরা কেহই পারি না! তাহার প্রমাণ আপনি পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই পাইবেন।

দাদের আকর্ষণ শক্তি ভয়ানক। ছেলেবেলায় গল্প

"শাড়ী"

ইণ্ডিয়ান সিল্ক
হাউস
২০৬, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
ব্রাঞ্চ—
টাওয়ার ব্লক
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

শুনিতাম, সমুদ্রের মধ্যে বহু চুম্বকের পাহাড় আছে, জাহাজ তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহারা আকর্ষণ করিয়া লইত। দাদের আকর্ষণ চুম্বকের আকর্ষণ হইতে কম শক্তিশালী নয়। ইহার নিকট স্বামী-স্ত্রীর আকর্ষণ কিছুই নয়। দাদ যখন আপনার হস্তকে আকর্ষণ করে, আপনি প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন উভয়ের সংস্পর্শ আপনি ঘটিতে দিবেন না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেন কি? জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত কোন্ মুহূর্ত্তে যে উভয়ের সংস্পর্শ ঘটিয়া যায় তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? তারপর একবার সংস্পর্শ ঘটিলে আর কি আপনি আপনাতে থাকিবেন? আপনি তখন স্বর্গপ্রয়াণ করিয়াছেন। মনে হইবে, কোথায় পৃথিবী, কোথায় আত্মীয়-স্বজন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া কোথায়ই বা আমাদের কলহ-কোলাহল! দেখিবেন, এই পুরাতন পৃথিবী আপনার সম্মুখ হইতে লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে। দেখিবেন, দেবদূতেরা মণিরত্নখচিত স্বর্গদ্বার খুলিয়া আপনার প্রবেশেরই অপেক্ষা করিতেছে। স্বর্গবাসী সকল দেবতা আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনাকে লইয়া গিয়া তাঁহারা একটি বেদীর উপর বসিতে দিলেন! চামরধারিণীরা আসিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। কিঙ্কর আসিয়া স্বর্ণপাত্র ভরিয়া অমৃত দিয়া গেল। আপনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেবদেবীগণ বসিয়া বসিয়া অমৃত ও ধূম্রবর্ত্তিকা সহযোগে রহস্যালাপ করিতেছেন। অদূরে নর্ত্তকীরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে। নানারূপ বাদ্যের সুমধুর ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছে। ফল-ফুলশোভিত তরুলতাসমূহ সুসন্নিবেশিত হইয়া সমস্ত স্বর্গভূমের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। শীতল বায়ুর মৃদুস্পর্শে তাহারা কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। ফুলেরা হাসিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া চারিদিকে তাহাদের সৌরভ ছড়াইয়া দিতেছে। বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতিগণ তাহাদের বর্ণে ও গন্ধে মত্ত হইয়া নাচিয়া নাচিয়া তাহাদের পরিভ্রমণ করিতেছে। মুগ্ধ অলিকুল চারিদিকে তাহাদের গুণগান করিয়া ফিরিতেছে। বহুদূরে নীলহ্রদটির সীমান্তে আকাশ গিয়া মিশিয়াছে। আকাশের বুকে সূর্য্য আছে, কিন্তু রৌদ্রের সে প্রখরতা নাই। চন্দ্রালোকের মতই তাহার স্নিগ্ধতা। ব্যাঘ্র, সিংহ, মৃগ, সর্প, ময়ূর সকলে হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া অলসভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে এক বিচিত্র ভূমি! এখানে ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, ক্রোধ নাই, কলহ নাই; আছে শুধু আনন্দ আর আনন্দ!

দাদ ও নখের সংস্পর্শ ইতিমধ্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। হয়তো একটু একটু রসও নির্গত হইতে সুরু হইয়াছিল। কিন্তু আপনি তখন কোথায়? আপনি তখন

THE INDIA ELECTRIC WORKS LIMITED

Head Office and Factory:
25, SOUTH ROAD, ENTALLY CALCUTTA

City Show-room:
10, CHOWRINGHEE ROAD CALCUTTA

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন, এ আনন্দ কি চিরস্থায়ী হয় না? ইহা কি আরও অধিক—আরও অনেক অধিক করিয়া পাওয়া যায় না? আহা, এই সময়ে যদি একটি কোব্‌রা বা

কার্ব্বলিক টুথ পাউডারের কৌটা পাইতাম! তবে তো ছাল চামড়া মাংস সমস্ত কুরিয়া কুরিয়া হাড় পর্য্যন্ত বাহির করিয়া ফেলিতে পারিতাম;

কিন্তু মানুষ অভিশপ্ত জীব। স্বর্গ তাহার ভাগ্যে স্থায়ী হয় না। মৃত্যুর পরে মানুষ স্বর্গে যায় কিনা, এবং গেলেও সে স্বর্গ স্থায়ী হয় কিনা জানি না। কিন্তু ইহজীবনে মানুষ মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যায়—ক্ষণিকের জন্য। এ অভিসম্পাত মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া বহিয়া আসিতেছে। হয়তো ইহা সেই আদম ও ইভেরই পাপের ফল। সুতরাং দেখা যায়, যখন ঐ স্বর্গীয় আনন্দ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পার্থিব দুঃখে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তখন বিকর্ষণ সুরু হইয়াছে।—দাদ ফুলিয়া রসে ও রক্তে টস টস করিতেছে; জ্বালা করিতেছে ভীষণ। তখন আপনার অনুতাপ হইবে, হায়, কেন একাজ করিলাম! এখন কাপড়ই বা পরিব কি করিয়া, পথে বাহির হইবই বা কেমন করিয়া? অমুকের সঙ্গে এন্‌গেজমেণ্ট রহিয়াছে, না যাইলে লোকটা ভাবিবেই বা কি,

আর লোকসানও হইবে অনেকগুলি টাকা! কিন্তু এ অবস্থায় খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া যাই-ই বা কি করিয়া! তারপর ডাক্তারের মলম লাগাইতে লাগাইতে হয়তো পুনরায় কঠোর শপথ করিয়া বসিবেন যে, আবার চুলকাইলে আপনি হাত কাটিয়া ফেলিবেন, কিন্তু দাদ স্পর্শ করিবেন না।

যাক, দাদের আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং চুলকানোর সুখ ও দুঃখের কথা সকলই বলিয়াছি। সংযম সম্বন্ধে আমি পুনরায় ইহাই বলিতে পারি যে, শ্রেষ্ঠ সংযম যদি কিছু থাকে, তাহা এই দাদ না চুলকানোর সংযম। ইহার মূল্যনিরূপণ অর্থ কেন, কিছু দিয়াই করা যায় না।

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
সভাপতি
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
পরিচালকবৃন্দ
স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়   রায় অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী বাহাদুর
শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু   রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর
শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী
হেড-অফিস
২নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা
এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করুন

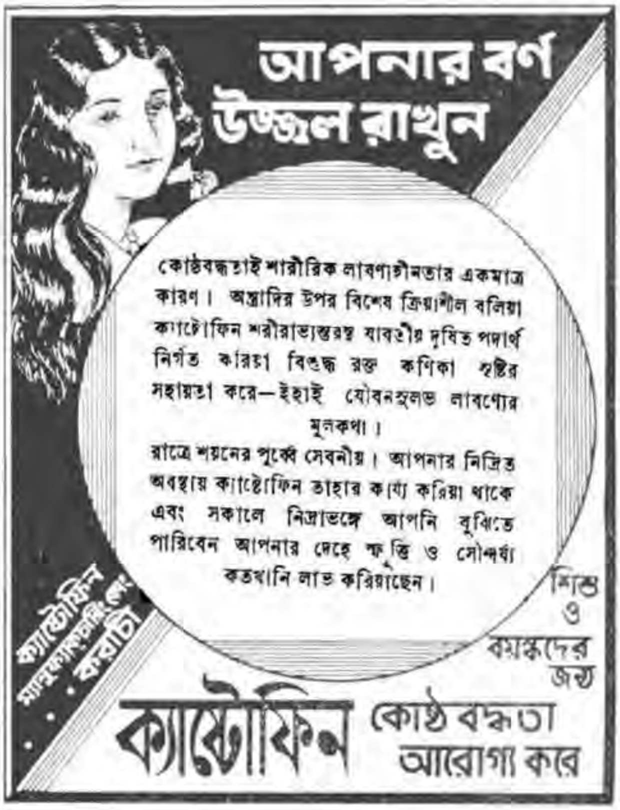

বিহ্‌টা দুর্ঘটনার পুনরাভিনয়

বিগত জুলাই মাসে পাটনার অনতিদূরে বিহ্‌টা ষ্টেশনের নিকট যে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটিয়াগিয়াছে সম্প্রতি তৎসম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। গাড়ী কিরূপভাবে লাইনচ্যুত হইলে বিহ্‌টার ঘটনার ন্যায় ঘটনা হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য তদন্ত কমিটি কর্ত্তৃক জামালপুরে একটি "ডামি" রেল দুর্ঘটনার ব্যবস্থা করা

হইয়াছিল,। এজন্য চারখানি বগি সহ একখানি ইঞ্জিনকে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। লাইনচ্যুত হইবার পর ডামি গাড়ীর যে অবস্থা হইয়াছিল ছবিতে তাহাই দেখান হইয়াছে। খণ্ড-বিখণ্ড বগিগুলির দৃশ্য বিহ্‌টা দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রেল দুর্ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ বিশদ তদন্ত ভারতে এই প্রথম।

যান আপনি ভারি ইয়ে

"—কোলাকুলি"

শ্রীআশু দে

৺পূজার "রসকথা" চাই। অর্থাৎ আনন্দ চাই। আমোদ-আহ্লাদ চাই। "আহ্লাদ"কেই দিলাম। "আহ্লাদ" কল্পনা নয়, স্থূল সত্য। সত্য যে কত স্থূল হইতে পারে, তা "আহ্লাদ"কে না দেখিলে ঠিক্ উপলব্ধি হয় না। মূর্ত্তিমান স্থূল সত্য, —"আহ্লাদ"চন্দ্র।

রাশিচক্রে কি আছে খোঁজ লই নাই,—কিন্তু বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি,—যে প্রত্যহ যে সব খাঁটি বাস্তব সত্য,—অর্থাৎ "উলঙ্গ" সত্য,—সম্মুখে আসিয়া নিজেদের জাহির করিতেছে,—তাহাদের দেখিয়া-শুনিয়া, কল্পনাদেবী এ পল্লী ছাড়িয়া পলাইয়াছেন। উলঙ্গ সত্যের ভিড় কমিতেছে না।

একটি কথাও "বানাইয়া" বলিবার যো নাই।

পিয়ানো যে কিনিবই,—এমন কোনো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করি নাই,—কিন্তু যখন শুনিলাম "ডেয়ার"সাহেব বিলাত যাইবার মুখে অন্যান্য আস্‌বাবের সহিত একটি আস্ত পিয়ানো ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন বাধ্য হইয়া সাহেবের দ্বারস্থ হইতে হইল। শুনিয়াছিলাম, দুই শত টাকার কমে ছাড়িবেন না।

অতএব, পকেটে পঞ্চাশটি টাকাও লইতে হইল।

এ সব ক্ষেত্রে যা বিধান আছে, সবই করিলাম। আরম্ভে ঘুণাক্ষরেও আভাস দিলাম না যে পিয়ানো কেনা সম্বন্ধে আমার তিলমাত্র প্রবৃত্তি আছে। কথায় কথায় পিয়ানোর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম যে জিনিষটা কি বিক্রীর উদ্দেশ্যে রাখা আছে? সাহেব বলিলেন, হাঁ।

মূল্য শুনিলাম,—এবং যথোচিত মন্তব্য জানাইলাম। অর্থাৎ সকালবেলা রসিকতা করায় বিপদ আছে,—এবং পিয়ানোটির যা অবস্থা তাহাতে অনাহুত অতিথির শয্যা হিসাবে ছাড়া আর কোনো কাজে ঐ কাঠের জরদ্‌গবটিকে ঘরে কেহইস্থান দিবে না।

সাহেব কিন্তু ভিজিলেন না। অতএব বাধ্য হইয়া মেমের সন্ধান করিতে হইল। কাছেই ছিলেন—সারা বাড়ীময়, খুট্-খুট্ ঘুর্-ঘুর করিয়া তন্বী, গৌরী, শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী বিদেশিনী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। পূর্ব্বে কিছু আলাপ ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, পিয়ানোর মালিক কে? গৌরী উত্তর দিলেন—আমি।

তবে সাহেব দাম-দস্তুর করে কোন্ অধিকারে?

মেম সাহেব একটি টেবিলের উপর প্রায় এক শতটি

ভালো-ভালো পড়েশ জড় করিয়াছিলেন। দাম জিজ্ঞাসা করিলাম,—শুনিলাম ছোটগুলি ৷৵০, বড়গুলি ৷৹০ আনা। নূতন দাম ৩০ টাকা হইতে ৭০ টাকা পর্যন্ত।

দশ টাকায় পঞ্চাশটি কিনিলাম। হিসাব করিয়া মেমকে বুঝাইয়া দিলাম যে একত্রে বিক্রী করিলে তাঁর লাভই হইবে।

তারপর পিয়ানো। কততে ছাড়িবেন? দেড় শত টাকার কমে নয়। আমার কাছে তখন মাত্র ৪০ টাকা। তবু বলিলাম ৫০ ।

মেমের টুক্‌টুকে ঠোঁটের ফাঁক দিয়া টুথপেস্টের ঝক্‌ঝকে ঝিলিক খেলিয়া গেল। বুঝিলাম, সুন্দরী হাসিতেছেন।

তারপর বলিলাম, ৭৫ টাকা। মেম বলিলেন যে মাত্র গত কাল এই সহরের বাঙ্গালী ডাক্তার সাহেব ১২৫ টাকা ডাক দিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

অগত্যা, শেষ অস্ত্রটি তূণ হইতে তুলিয়া লইতে হইল। বলিলাম, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু তিনি কি আপনার চোখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন?"

"তার অর্থ?"

"অর্থ আর কি, ঐ চোখের দিকে একবার চাহিলে কি দামদস্তুর করিবার কথা মনে পড়ে? এ সহরে আর একটি জোড়া ও রকম চোখ·····আচ্ছা, ৮৫ টাকা দিব!"

"আপনি কি বলছেন,—ঠিক বুঝতে পারছিনে যে!"

"বলছি এই যে পিয়ানোটিকে চেয়ার আলমারীর সামিল করিবেন না। এটুকু ভেবে দেখছেন না, যে এই পিয়ানো যদি আমার বাড়ী যায়,—যতবার পিয়ানোর চাবীতে ঝঙ্কার দেব,—পিয়ানোর উপর ঐ চোখ দুটি ·········"

"—যান্—আপনি ভারী ইয়ে! কত দেবেন? ৮৫? আচ্ছা নিয়ে যান্···কিন্তু আপনি...ভারী ইয়ে!"

সাহেব পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মেমের চম্পক অঙ্গুলিকটির মধ্যে চারখানি দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া আসিলাম। বাকি টাকা পর দিন সকালে দিলাম। ১৬টি প্রমাণ হরিজনের কাঁধে চড়িয়া পিয়ানো বাড়ী পৌঁছিল।

পিয়ানোটির কিছু মেরামতের প্রয়োজন ছিল। কলিকাতার একটি দোকানে খবর দিলাম। দিন ৫।৬ পরে বাগানে বেড়াইতেছি,—গেটের কাছে একটি অ-চেনা মূর্ত্তির আভাস পাইলাম। অগ্রসর হইয়া গেলাম

"আপনি কে?" "আজ্ঞে, আমি আহ্লাদ!"

"তার মানে?...আপনার নাম কি?" "আজ্ঞে, আহ্লাদ!"

সে কি! "ভালো নাম কি?" "আজ্ঞে, আহ্লাদচন্দ্র মহাপাত্র!" অসম্ভব, অসম্ভব! সত্য কি এত উলঙ্গ হয়?

"আপনি কি চান্?" "আজ্ঞে, পিয়ানো টিউন করব!"

"আপনি কি কল্‌কাতা থেকে আসছেন?" "আজ্ঞে!"

একটু ভাবিলাম। "আচ্ছা তোমার বড় ভাই আছে?" "আজ্ঞে আছে।" "কি নাম?" "আজ্ঞে প্রহ্লাদচন্দ্র মহাপাত্র!" বুঝিলাম। "ছোট ভাই?" "আজ্ঞে নাই!" "যদি হয়, তো কি নাম হবে?" "আজ্ঞে?" "বাড়ীতে বলে দিও, জহ্লাদ নামটা চল্‌বে না!" "আজ্ঞে, কি বল্‌ছেন?"

মাইরি, এ রকম খাঁটি কুকুর আমাদের বরানগরে একটিও দেখিনি।

"যাক্ ও কথা, ভিতরে এস।" গেটটা খুলিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম, আহ্লাদ বলিতেছে, "কি খাঁটি গেটক্, মাইরী!"

"খাঁটি" গেটক্! ভাষাটা একেবারে নূতন। ভাবিবার সময় পাইলাম না, শুনিলাম আহ্লাদ বলিতেছে, "বাস্তবিক,—কি খাঁটি রাস্তা!" অর্থাৎ আমার কম্পাউণ্ডের রাস্তা। সিঁড়ীর ধারে একটি কুকুর বাঁধা ছিল। আহ্লাদ একবার দেখিল,—এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"মাইরি এ রকম খাঁটি কুকুর আমাদের বরানগরে একটি দেখিনি! বিলিতী,—কি বলেন?"...

পিয়ানোর দশ হাত দূর হইতে বলিল—"এ রকম খাঁটি পিয়ানো জীবনে দেখিনি মশাই!"...এবং ইহাও শুনিলাম যে এ রকম খাঁটি পিয়ানোর চাবী, তার, পিতল, লোহা, কাঠ,—ইত্যাদি এবং আমার ড্রইং রুমের মত খাঁটি সোফা, কুশন, পরদা, গা-পোষ, ফুলদানী, ছবিও সে পূর্ব্বে কখন দেখেনি।

তাহাতেও চক্ষু ফোটে নাই। কিন্তু তার পরদিন যখন সমস্ত আসবাবপত্র, গাছ-পালা, জন্তুজীব সব শেষ করিয়া বলিল

যে "সত্যি বলছি মশাই আপনার মত এমন খাঁটি লোক দেখিনি" এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া ফেলিল "কি খাঁটি চোখ মাইরি!" কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

প্রতিধ্বনি কি এতদিন পরে ফিরিয়া আসে? "সেই নীল নলিন নয়ন দুটি,—আঁখি তারকায় অমৃত পরশ…………!" যেন এতদিনে গভীর সমুদ্রবক্ষে! "খাঁটি চোখ!"

এই খাঁটি পথের শেষে উত্তরকালে আহ্লাদচন্দ্র "বিল" হস্তে যে খাঁটি অভিনয় আরম্ভ করিবে, তাহা চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল; অতএব উদ্যোগ করিতে হইল; নানা গোপনীয় স্থান হইতে বৈধব্যের জন্য সাধ্যমত গোপনে যোগাড় করিয়া রাখিলাম। অনেক দিনের সঞ্চয়,—অনেক বৎসরের আহরণ।

যথাসময়ে আহ্লাদ "বিল" হস্তে উপস্থিত হইল। ৩০৲ টাকা। প্রশ্ন করিলাম,—"আহ্লাদ, এমন খাঁটি জায়গা আর দেখেছ?" আহ্লাদ একেবারে গদগদ ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল—হুজুরের কাছে খাঁটি জিনিষ ছাড়া কিছু থাকতে পারে একথা বলে কোন্ পাজীর সহোদর ভাই?"

"তবে আর বিলটা কাটিব না। নাও, সবটাই মঞ্জুর করে দিলাম।" এই বলিয়া ৩০টি টাকাই হাতে তুলিয়া দিলাম।

বাজাইয়া দিলাম না। বাজাইল "আহ্লাদ।" ৩০টি টাকা আওয়াজ করিল প্রায় তিনশতবার। বাজাইবার শেষে আমার খাঁটি চোখের দিকে চাহিয়া রহিল প্রায় তিন মিনিট। "বলি-বলি-বলা-হোল না।" তারপর একেবারে সাষ্টাঙ্গে করিল এক দীর্ঘ প্রণাম।

এবং চলিয়া গেল।...প্রায় পাঁচ বছরের সঞ্চয়, এবং খাঁটি সদ্গতি হইয়া গেল।

উলঙ্গ সত্য। জীবনের নিত্যস্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে।

ক্রুর কামানল মন্ত্র (৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

আরও দশ দিন পরে শুধু হেমন্ত রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিতেছে, জোচ্চুরির আর জায়গা পাননি মশায়! নালিশ করব আমি—

রামসদয় কবিরাজ এত সব ভাবেন নাই। অবধূত সন্ন্যাসী তাঁহার ভরসা। বলিলেন, অসম্ভব বাবা, এ হতেই হবে। তোমার ভুল হচ্ছে না তো!

—দেখুন, এ চালাকিতে আমি ভুলছি না।

কবিরাজ মহাশয় ফাঁপরে পড়িলেন। একি ব্যাপার! তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

'হর হর বোম বোম' ধ্বনির সঙ্গে দরজায় করাঘাত হইতে লাগিল। 'জয় গুরু' বলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কবিরাজ মহাশয় দরজা খুলিতেই অবধূত সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল।

সমস্ত শুনিয়া অবধূত বলিলেন, দেখি মাদুলি! হেমন্ত প্রস্তুত হইয়াই ছিল—উৎপলের হাতে মাদুলিটা দিল। ভুজপত্র বাহির হইল। অবধূত চমকাইলেন। হেমন্তকে বলিলেন, তুমি একটু বাইরে যাও তো বাবা। হেমন্ত বাহির হইয়া গেল।

বিমূঢ় রামসদয় কাদ-কাদ হইয়া বলিলেন, অসম্ভব গুরুদেব, তা কেমন করে হয়?

—হতেই হবে বৎস, নইলে ব্যবসা ছাড়তে হবে, হয় তো মামলা-মোকদ্দমা—রামসদয় কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, এখন উপায়?

অবধূত বলিলেন, তোমার মেয়ে বলেই মন্ত্রে কাজ হয়নি, নইলে ও এতক্ষণ ছুটে বেরিয়ে যেত—

—সামাজিক গোলযোগ—

—অবধূতের সমাজ নেই বৎস!

শুকতারা মুখ নীচু করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, ও আমি আগেই জানতাম। যে তোমার চার্টনি! কিন্তু তুমি কাজটা ভাল করনি। আমার বড়ো দাদাকে নিয়ে—উনি যদি জানতে পারেন কখনো?

—তুমি পাগল হয়েছ শুকু! আমি পাশের বাড়ীতে থাকি, আমাকেই চিনতে পারেননি, যেমন উৎপলকে কখনও উনি চিনতে পারবেন না। উৎপল কিন্তু দাড়ি বড় জোর রেখেছে।

প্রশ্ন করা উচিত হইবে কিনা শুকতারা বুঝিতে পারিল না, তথাপি জোর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি?

—'ক্রুর কামানল মন্ত্র' নিয়ে একটা নাটক লিখেছে, সেটা ছাপিয়ে দিতে হবে, নাট্যসমিতিরা অভিনয় করবে।

নলিনী বলিল, দাদার খবরই এই, কিন্তু তুই কি বল দেখি—যদি কবিরাজ মশাই রাজি না হতেন?

—তা কি হতে পারে ঠাকুরঝি, তবে জন্ম থেকেই লেখা আছে।

—তা হলে সত্যি?

—সত্যি।

মা কোনও দিনই ছেলের হদিস পান নাই, এবারেও পাইলেন না। সমস্ত ব্যাপারটা কিছুতেই তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে আনিতে না পারিলেও তিনি বিরক্ত হইতে পারিলেন না। বউয়ের মুখখানি তাঁহার বড়ই পছন্দ হইয়াছিল—যাকে বলে লক্ষ্মীমন্ত শুকতারার সমস্ত লক্ষণ ছিল তাহাই। তাইতো কিছুতেই বলা চলে না। তিনি শুধু নলিনীকে ডাকিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি বল্ তো নলি? হেমা কেমন বোকা পড়ে গেল কেন? সোজাসুজি বললেই—

নলিনী বলিল, তুমি ক্ষেপেছ মাসীমা, তাহলে কি দাদা কোনও কালে বিয়ে করত? ভাগ্যিস্ এই রকমটা হোল!

—কি জানি বাপু, বলিয়া মাসীমা আর একবার নববধূর মুখখানি দেখিতে গেলেন। বেহাইয়ের লাঞ্ছনা, তাঁহার হইয়া ছেলেই করিয়াছে—এইজন্য অনুতাপ তাঁহার কোনও দিন যায় নাই। সরকার মহাশয় আজকালকার ছেলেদের একদম বিশ্বাস করিতেন না, তিনি মোটেই অবাক হইলেন না।

গুরু অবধূত সন্ন্যাসী অদৃশ্য। কবিরাজের পুরাতন সাইন বোর্ডটা আবার যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয় আজকাল বাড়ীতেই স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতেছেন।

দুনিয়ায় সর্ব্বত্র

যেখানেই রূপের কদর—
যেখানেই রূপের আদর—

ওটীন ক্রীম

আর তার আনুসঙ্গিক প্রসাধন সামগ্রী .সেখানেই পেয়েছে আদর—সেখানেই পেয়েছে প্রশংসা। ভারতের আবহাওয়ায় ত্বক ও বর্ণের লাবণ্য অল্পদিনের মধ্যেই নিস্প্রভ হয়ে যায়। তাই এখানে **ওটীন** শুধু বিলাসিতা বলেই নয় অপরিহার্য্যও বটে। প্রত্যহ রাতে ৫।১০ মিনিট **ওটীন ক্রীম** মাখলে উপর চামড়ার টিসুগুলো পরিষ্কার ও সতেজ হয়; আর আপনি যখন ঘুমিয়ে থাকবেন তখন চামড়ার নীচের টিসুগুলোর ভিতর ক্রীম প্রবেশ ক'রে আপনার নতুন রূপ ফুটিয়ে তুলবে।

ওটীন স্নো

চামড়ার উপরে মিলিয়ে যায়—মোটেই চট্‌চট করে না। দিনের বেলা মাখলে ধূলো, বাতাস ও রোদ বৃষ্টি থেকে চামড়াকে রক্ষা করে—দেয় স্নিগ্ধতা আর মুখখানি করে চিরসুন্দর।

দি ওটীন কোং—১৭, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।